ভূমিকা

১৯৬০ এর দশকের শুরম্নর দিকের কথা। আমি ছাত্র তখন। মহাবিশ্বের শুরম্নর রহস্য জানার অপরিসীম কৌতূহল সবার চোখে-মুখে। বিগ ব্যাং তত্ত্বের জন্ম সেই ১৯২০ এর দশকে হলেও একে গুরম্নত্বের সাথে নেওয়া শুরম্ন ১৯৫০ এর দশকের পরে। সবাই এর সাথে পরিচিত থাকলেও তত্ত্বটি তখনও তেমন কোনো আস্থা অর্জন করতে পারেনি। ওদিকে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আছে স্থির অবস্থা তত্ত্ব (steady-state theory)। মহাবিশ্বের কোনো শুরম্ন থাকতে পারে সে সম্ভাবনাই এটি নাকচ করে দিয়েছে। বিভিন্ন মহলের কাছে এটি তখনও সবচেয়ে গহণযোগ্য তত্ত্ব। এরপর ১৯৬৫ সালে এল রবার্ট পেনজিয়াস ও আর্নো উইলসনের আবিষ্কার। মহাজাগতিক পটভূমি তাপ বিকিরণ। দৃশ্যপট পুরোপুরি পাল্টে গেল। পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হলো, একটি উত্তপ্ত, উন্মত্ত ও আকস্মিক অবস্থা থেকে শুরম্ন মহাবিশ্বের।

কসমোলজিস্টরা আবিষ্কারের ফলাফল বের করতে উঠেপড়ে লাগলেন। বিগ ব্যাং এর ১০ লাখ বছর পরে মহাবিশ্ব কতটা উত্তপ্ত ছিল? এক বছর পর? এক সেকেন্ড পর? সেই প্রারম্ভিক চুলিস্নতে কোন ধরনের ভৌত প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়েছিল? সৃষ্টির শুরর কোনো ধ্বংসাবশেষ বাকি আছে কি? যা থেকে জানা যাবে সেই সময়ের চরম অবস্থার খবর।

আমার ভালোমতো মনে আছে, ১৯৬৮ সালে একটি লেকচার শুনতে গিয়েছিলাম। সবশেষে অধ্যাপক পটভূমি তাপ বিকিরণের আবিষ্কারের আলোকে বিগ ব্যাং নিয়ে কথা বললেন। হাসিমুখে বললেন, “বিগ ব্যাং এর পরের প্রথম তিন মিনিটে সংঘটিত নিউক্লিয় প্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে কিছু তাত্ত্বিক মহাবিশ্বের রাসায়নিক উপাদানের বিবরণ দিয়েছেন।” দর্শকরা হাসিতে ফেটে পড়লেন। মহাবিশ্বের জন্মের মাত্র সামান্য সময় পরের অবস্থার বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা কতই না হাস্যকর! এমনকি সপ্তদশ শতকের যাজক জেমস উশারও এমন দুঃসাহস করেননি। অথচ তিনিই কিন্তু বাইবেলের ক্রমানপুঞ্জির ওপর ভিত্তি করে দাবি করেছিলেন, ৪০০৪ খৃষ্টপূর্ব সালের ২৩ অক্টোবর তারিখে সৃষ্টি হয়েছিল মহাবিশ্বের। কিন্তু প্রথম তিন মিনিটের ঘটনা প্রবাহের নিখুঁত বর্ণনা তিনিও দিতে চেষ্টা করেননি।

কিন্তু মহাজাগতিক তাপ বিকিরণ আবিষ্কারের মাত্র এক দশকের মধ্যেই পাল্টে গেল বিজ্ঞানের গতি (cosmic

background heat radiation)। প্রথম তিন মিনিট ছাত্রদেরও মনোযোগ কেড়ে নিল। বই লেখা হতে লাগল। ১৯৭৭ সালে অ্যামেরিকান পদার্থবিদ ও কসমোলজিস্ট স্টিভেন উইনবার্গ লিখলেন একটি বেস্ট সেলার বই। শিরোনাম দ্য *ফার্স্ট থ্রি মিনিটস* বা প্রথম তিন মিনিট। জনপ্রিয় বিজ্ঞান প্রকাশনার জগতে এটি নতুন ধারার প্রবর্তন করে। লেখক বিশ্ববিখ্যাত একজন প্লিত। বিগ ব্যাং এর ঠিক পরের প্রক্রিয়াগুলো সাধারণ পাঠকের জন্যে লিখেছেন বিসত্মারিত ও বোধগম্য করে।

এক দিকে উত্তেজক আবিষ্কারগুলো সাধারণ মানুষ আসেত্ম আসেত্ম বুঝতে শুরম্ন করেছেন। ওদিকে বিজ্ঞানীরাও বসে নেই। আগ্রহের বিষয় গেল পাল্টে। এক সময় আগ্রহের বিষয় ছিল মহাবিশ্বের প্রারম্ভিক অবস্থার খোঁজ জানা। মানে জন্মের প্রায় কয়েক মিনিট পরের কথা। আর এখন আগ্রহের বিষয় হয়ে গেলে তারও অনেক আগের খবর। জন্মের এক সেকেন্ডের প্রায় অসীম ভগ্নাংশ সময় পরের অবস্থা। তার প্রায় এক দশক পরে ব্রিটিশ গাণিতিক পদার্থবিদ স্টিফের হকিং লিখলেন অ্যা *ব্রিফ হিস্টরি অব টাইম।* এক সেকেন্ডের দশ কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি ভাগের এক ভাগ সময়ে কী ঘটেছিল তাও বললেন তিনি। ১৯৬৮ সালের সেই লেকচারের শেষ হাসিটুকই আজ হাস্যকর হয়ে গেছে।

বিগ ব্যাং তত্ত্ব এখন বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করে ফেলেছে। ফলে এখন বেশি চিন্ত্মা-ভাবনা চলছে মহাবিশ্বের ভবিষ্যত্ নিয়ে। মহাবিশ্বের শুরম্নর খবর আমরা ভালোই জানি। কিন্তু এর পরিণতি কেমন হবে? এর চূড়ান্ত্ম পরিণতি সম্পর্কে কী বলা যায়? শেষও কি হবে ব্যাং (বিস্ফোরণ) বা আর্তনাদের মাধ্যমে? বা আদৌ কি এর শেষ আছে? আমাদেরই বা কী হবে? আমরা বা আমাদের পরের প্রজন্ম কি চিরকাল টিকে থাকবে? যদিওবা সেটা হয় রক্ত-মাংসের গড়া বা রোবটিক শরীর।

বিষয়গুলো নিয়ে কৌতূহলী না হয়েও উপায় নেই। যদিও পৃথিবীর শেষ এখনও দূরে আছে বলেই মনে হচ্ছে। বর্তমানে মানব-সৃষ্ট নানা সমস্যায় জর্জরিত পৃথিবীতে আগে আমরা নিছক পৃথিবীতে টিকে থাকার সংগ্রাম নিয়ে চিন্ত্মা করতাম। এখন ঘুরে গেছে সে চিন্ত্মার মোড়। আমাদেরকে এখন আমাদের অসিত্মত্বের মহাজাগতিক দিক নিয়ে ভাবতে হচ্ছে। দ্য *লাস্ট থ্রি মিনিটস* বইয়ে বলব ভবিষ্যত্ মহাবিশ্বের গল্প। বিখ্যাত কিছু পদার্থবিদ ও কসমোলজিস্টদের সর্বশেষ চিন্ত্মার আলোকে সবচেয়ে সেরা অনুমানটুকুই আমরা তুলে ধরব। এটা কল্পনানির্ভর হবে না। সত্যি বলতে, ভবিষ্যতে নজিরবিহীন অনেক কিছুই ঘটতে পারে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, যেটা একবার অসিত্মত্বে আসতে পারে, সেটা অসিত্মত্ব হারাতেও পারে।

এ বইটি সাধারণ পাঠকের জন্যে লেখা। বিজ্ঞান বা গণিতের কোনো পূর্ব জ্ঞান না থাকলেও চলবে। তবে, মাঝেমাঝেই আমাকে অনেক বড় বা অনেক ছোট সংখ্যা নিয়ে কথা বলতে হবে। এ ড়্গেত্রে ১০ এর ঘাত (পাওয়ার) ভিত্তিক সংড়্গিপ্ত গাণিতিক প্রতিক ব্যবহার করলে সুবিধা হবে। যেমন, দশ হাজার কোটিকে লিখতে গেলে ১০০,০০০,০০০,০০০ লিখতে হয়। এটা অসুবিধাজনক। এখানে ১ এর পরে ১১টি শূন্য আছে। ফলে, আমরা একে ১০১১ বা ১০ এর ১১তম ঘাত আকারে লিখতে পারি। একইভাবে দশ লড়্গ হলো ১০৬, এক লড়্গ কোটি হলো ১০১২ ইত্যাদি। তবে মনে রাখতে হবে, এই প্রতিকের মাধ্যমে সংখ্যাগুলোর বৃদ্ধির হার সরাসরি বোঝা কঠিন। ১০১২ সংখ্যাটি ১০১০ এর একশ গুণ। প্রায় একই মনে হলেও পার্থক্যটা কিন্তু বিশাল। ১০ এর পাওয়ার ঋণাত্মক বসিয়ে আবার খুব ছোট সংখ্যাদেরকেও প্রকাশ করা যায়। যেমন, একশ কোটির এক ভাগ বা ১/১,০০০,০০০,০০০ কে ১০-৯  (টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস নাইন) লেখা যায়। কারণ, ভগ্নাংশের হরে ১ এর পরে ৯টি শূন্য আছে।

শেষমেশ পাঠককে একটা কথা বলে রাখি। স্বাভাবিকভাবেই বইটির অনেকটাই অনুমান নির্ভর। হ্যাঁ, বইয়ের অধিকাংশ কথাই বর্তমান বিজ্ঞানের সেরা তথ্যের আলোকেই বলা হয়েছে। কিন্তু এরপরেও ভবিষ্যদের পূর্বাভাস অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তথ্যের সমান মর্যাদা পেতে পারে না। তবুও মহাবিশ্বের চূড়ান্ত্ম পরিণতি নিয়ে অনুমান করার লোভ ঠেকানো সম্ভব নয়। এই খোলা মনের আলোকেই বইটি লেখা। বৈজ্ঞানিকভাবে এ কথাগুলো মোটামুটি স্বীকৃত যে বিগ ব্যাং এর মাধ্যমে মহাবিশ্বের শুরম্ন হয়েছে, এখন এটি শীতল ও প্রসারিত হতে হতে বিপরীত ধর্মের কোনো চূড়ান্ত্ম অবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, অথবা হয়ত উন্মত্তভাবে সংকুচিত হয়ে যাবে। তবে যে সুদীর্ঘ সময় নিয়ে আমরা কথা বলছি, তাতে কোন ভৗৈত প্রক্রিয়া যে প্রভাবশালী ভূমিকা রাখবে তা খুব বেশি নিশ্চিত করে বলার সুযোগ নেই। সাধারণ নড়্গত্রের পরিণতি সম্পর্কে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা মোটামুটি পরিষ্কার। নিউট্রন নড়্গত্র ও বস্ন্যাক হোলে েমৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও তাঁদের ধারণা দিন দিন সমৃদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু যদি মহাবিশ্ব আরও লড়্গ কোটি বছর বা তারও বেশি সময় টিকে থাকে, তাহলে এতে এমন কোনো সূক্ষ্ম ভৗৈত প্রতিক্রিয়া ঘটতেও পারে, যা সম্পর্কে আমাদের অনুমান করা ছাড়া কিছু করার নেই। এক সময় হয়ত সেটাই হবে গুরম্নত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া।

প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান কিন্তু অসম্পূর্ণ। ফলে মহাবিশ্বের চূড়ান্ত্ম পরিণতি জানার চেষ্টা ও অনুমান করার উপায় আছে একটিই। আমাদের হাতে যেসব তত্ত্ব আছে সেগুলোকে কাজে লাগিয়েই যুক্তিভিত্তিক কোনো সিদ্ধান্ত্মে পৌঁছতে হবে। কিন্তু এতেও সমস্যা আছে। মহাবিশ্বের পরিণতি বিষয়ক অনেকগুলো তত্ত্বেরই এখন পর্যন্ত্ম প্রায়োগিক পরীড়্গা হয়নি। এমন কিছু বিষয়েও আলোচনা করেছি, যেগুলো নিয়ে তাত্ত্বিকরা খুব আশাবাদী, কিন্তু এখনও তার প্রমাণ মেলেনি। যেমন, মহাকর্ষ তরঙ্গ নির্গমন১, প্রোটন ড়্গয় (proton decay) ও বস্ন্যাক হোল রেডিয়্যান্স। আবার একইভাবে এমন কোনো ভৌত প্রক্রিয়াও নিশ্চয়ই থাকবে যা আমরা এখন একেবারেই জানি না। হয়ত সেটা এ বইয়ের কথাগুলোকে বহুলাংশে পাল্টে দেবে।

মহাবিশ্বে বৃদ্ধিমান প্রাণীর সম্ভাব্য কার্যক্রমের কথা ভাবলে এই অনিশ্চয়তাই আরও বড় হয়ে দেখা দেয়। এবারে আমরা বিজ্ঞান কল্পকাহিনির জগতে প্রবেশ করে ফেলেছি। তবুও এমনটাতো হতেই পারে যে কালের আবর্তনে এক সময় জীবিত প্রাণীরা ভৌত সিস্টেমের আচরণ ক্রমেই বড় পরিসরে উলেস্নখযোগ্য রকম পরিবর্তন করে ফেলল। মহাবিশ্বের প্রাণ সম্পর্কেও আমি আলোচনা করেছি। কারণ, অনেক পাঠক মহাবিশ্বের পরিণতি জানতে চান মূলত মানুষ বা তার পরবর্তী প্রজন্মের পরিণতি জানার জন্যেই। তবে, মনে রাখতে হবে মানুষের চেতনার প্রকৃতি সম্পর্কে এখনও বিজ্ঞানীরা সঠিক করে কিছুই জানেন না। এটাও জানা নেই যে দূর ভবিষ্যতে অসিত্মত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে চেতনার মধ্যে কোন কোন গুণাবলী থাকা প্রয়োজন।

বইটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে সহায়ক আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্যে কয়েকজন মানুষকে ধন্যবাদ দিতেই হয়। এঁরা হলেন জন ব্যারো, ফ্র্যংিক টিপলার, জ্যাসন টমলি, রজার পেনরোজ ও ডানকান স্টিল। সিরিজের সম্পাদক জেরি লিয়ন পা্লুলিপি গুরম্নত্বের সাথে পড়ে দিয়েছিলেন। এজন্যে তাঁকেও ধন্যবাদ। চূড়ান্ত্ম পা্লুলিপিতে কাজ করার জন্যে স্যারা লিপিনকটকেও ধন্যবাদ।

অনুবাদকের নোট:

1. ২০১৬ সালের ফেব্রম্নয়ারি মাসে এ তরঙ্গ পাওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। অবশ্য পাওয়া গিয়েছিল আগের বছরের অক্টোবরেই। ফলে বইটির গুরম্নত্ব বাড়ল বলা চলে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহাপ্রলয়

তারিখ: ২১ আগস্ট, ২১২৬। মহাপ্রলয়

স্থান: পৃথিবী।

*পৃথিবীর নানা প্রান্ত্মে হতাশায় আচ্ছন্ন অনেকগুলো মানুষ লুকানোর চেষ্টায় ব্যসত্ম। কোটি কোটি মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে। কেউ কেউ পালিয়েছে ভূমির গভীরে। আশ্রয় নিয়েছে গুহা বা খনির দেয়ালে। কেউ আবার সাবমেরিনে চেপে সাগরে ডুব দিয়েছে। কেউ কেউ বেপরোভাবে এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করছে। তবে অধিকাংশ মানুষই হতবুদ্ধি ও বিষণ্ন হয়ে বসে আছে। অপেড়্গা করছে শেষ পরণিতির জন্যে।*

*আকাশের অনেক উঁচুতে আলোর একটি বড় রেখা দেখা যাচ্ছে। শুরতে শুধু দেখা গিয়েছিল হালকা ধোঁয়ার মুদু বিকিরণ। একদিন সেটাই মহাশূন্যের বুকে গড়ে তুলল ফুটন্ত্ম গ্যাসের প্রচ্ল ঘুর্ণি। গ্যানের ওপরের দিকে একটি কালো, কুিসত ও ভয়ানক জিনিস দেখা যাচ্ছে। ধূমকেতুটির ড়্গুদ্র মাথা দেখে এর ভয়ানক ধ্বংসাত্মক ড়্গমতা আঁঁচ করা কঠিন। সেকেন্ডে প্রায় চলিস্নশ হাজার মাইল বেগে এটি ধেয়ে আসছে পৃথিবীর দিকে। প্রতি সেকেন্ডে দশ মাইল। লড়্গ কোটি টন বরফ ও পাথর শব্দের সত্তর গুণ বেগে পৃথিবীতে আঘাত হানার জন্যে প্রস্তুত।*

*দেখা ও অপেড়্গা করা ছাড়া মানুষের করার কিছুই নেই। অনিবার্য পরিণতির মুখে পড়ে বিজ্ঞানীরা বহু আগেই টেলিস্কোপ থেকে মুখ সরিয়ে নিয়েছেন। নিরবে বন্ধ করে দিয়েছেন কম্পিউটার। দূর্যোগের সঠিক আচরণ এখনও সঠিকভাবে বোঝ যাচ্ছে না। যেটুকু জানা গেছে, সেটাই এত ভয়াবহ যে তা সাধারণ মানুষকে জানানো ঠিক হবে না। কোনো কোনো বিজ্ঞানী টিকে থাকার কিছু পূর্ণাঙ্গ কৌশল তৈরি করেছেন। নিজেদের টেকনিক্যাল জ্ঞান কাজে লাগিয়ে অন্যদের তুলনায় সুবিধাজনক অবস্থায় থাকার ইচ্ছে তাদের। কেউ কেউ দূর্যোগটিকে মনোযোগ দিয়ে পর্যবেড়্গণের চেষ্টারত। শেষ দিনটি পর্যন্ত্মও তাঁরা তাঁদের সত্যিকার বিজ্ঞানীসুলভ আচরণ বজায় রাখতে চাচ্ছেন। পৃথিবীর গভীরে রাখা টাইম ক্যাপসুলে পাঠিয়ে দিচ্ছেন সে উপাত্ত। উদ্দেশ্য, ভবিষ্যত্ বংশধররা যাতে সেটা কাজে লাগাতে পারেন।*

*সংঘর্ষের মুহূর্ত আরও ঘনিয়ে এল। সারা পৃথিবীর লাখ লাখ মানুষ ভয়ে ভয়ে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। শেষ তিনটি মিনিট।*

*গ্রাইন্ড জিরোর ঠিক ওপরে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে গেল। এক হাজার ঘন মাইল পরিমাণ বায়ু ছুটে গেল একদিকে। একটি শহরের আকারের চেয়েও বেশি পরিমাণ ধোঁয়া কু্ললি পাকিয়ে ভূমির দিকে এগিয়ে আসছে। পনের সেকেন্ড পরেই আঘাত হানল ভূপৃষ্ঠে। দশ হাজার ভূমিকম্পের সমান আঘাতে কেঁপে ওঠল পৃথিবী। স্থানান্ত্মরিত বাতাসের শক ওয়েভ উড়ে যাচ্ছে পৃথিবী পৃষ্ঠের ওপরদিয়ে। ভেঙে পড়ল স্থাপনাগুলো। যাই সামনে পড়ল, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সংঘর্ষের স্থানের চারপাশে সমতল ভূমিতে একটি বৃত্তাকার তরল পাহাড় তৈরি হলো। উচ্চতা কয়েক মাইল। একশো মিটার চওড়া গর্ত দিয়ে পৃথিবীর ভেতরের বস্তু বেরিয়ে আসছে। গলিত পাথরের দেয়াল ঢেউ তুলে ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। এ তীব্র আঘাতের সামনে ভূপৃষ্ঠ যেন সামান্য একটি কম্বল।*

*গর্তের ভেতরের লড়্গ কোটি টন পাথর বাষ্পীভূত হয়ে গেছে। তার চেয়ে অনেক বেশি ছিটকে ওপরে উঠে যাচ্ছে। কিছু কিছু চলে যাচ্ছে মহাকাশের দিকেও। এর চেয়ে বেশি পরিমাণে নিড়্গিপ্ত হচ্ছে অর্ধ-মহাদেশ এলাকা জুড়ে। এরপর পতিত হচ্ছে শত শত, এমনকি হাজার হাজার মাইল দূরের এলাকায়। যেখানেই তা পড়ছে, ঘটাচ্ছে মারাত্মক ধ্বংসযজ্ঞ। কিছু কিছু নিড়্গিপ্ত পদার্থ গিয়ে পড়ছে সাগরে। সেট থেকে শুরম্ন হচ্ছে সুনামি। ফলে দূর্যোগের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেল। ধুলোময় ধ্বংসাবশেষের একটি বড় অংশ বায়ুম্ললে উঠে গেল। সূর্য পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গেল। সূর্যের আলোর মুখ দেখা যাচ্ছে না পৃথিবীর কোথাও থেকেই। তার বদলে দেখা যাচ্ছে শত কোটি উল্কার পৈশাচিক ঝলকানি। তীব্র উত্তাপ পাঠিয়ে এরা ঝলসে দিচ্ছে মাটির পৃথিবী। কারণ বিচ্ছিন্ন খ্লগুলো মহাশূন থেকে ফের ফিরে আসছে বায়ম্ললে।*

উপরের দৃশ্যপটটি একটি অনুমান। সু্ইফট টাটল (Swift-Tuttle) নামের একটি ধূমকেতু ২১২৬ সালের ২১ আগস্ট তারিখে পৃথিবীতে আঘাত হানবে। যদি সেটাই ঘটে, বৈশ্বিক দূযোর্গ অবধারিত। ইতি ঘটবে মানুষেরও। ১৯৯৩ সালে একে দেখার পরে হিসাব-নিকাশ করে দেখা গেল ২১২৬ সালে একটি সংঘর্ষ হচ্ছেই। পরে সংশোধিত হিসাবে দেখা যায়, এটি সপ্তাহের জন্যে পৃথিবীকে মিস করবে। অল্পের জন্য বাঁচা। আমরা এর দিক থেকে নিশ্চিন্ত্মেই থাকতে পারি। তবে বিপদ যে একেবারেই নেই তা কিন্তু নয়। আজ হোক, কাল হোক, সুইফট টাটল বা এরই মতো কেউ পৃথিবীতে আঘাত হানবেই। হিসাবে দেখা গেছে, অর্ধ-কিলোমিটার বা তারও বেশি চওড়া দশ হাজার বস্তুর কড়্গপথ পৃথিবীর কড়্গপথের ওপর দিয়ে গেছে। বিশাল বিশাল এই উপদ্রপগুলোর জন্ম সৌরজগতের বহিঃসত্ম শীতল এলাকায়। কিছু কিছু হলো ধূমকেতুর ধ্বংসাবশেষ। আটকা পড়ে আছে গ্রহদের মহাকর্ষীয় বাঁধনে। অন্যদের উত্পত্তি গ্রহাণু বেষ্টনীতে (asteroid belt)। জায়গাটা মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মাঝখানে। কড়্গপথের ভারসাম্যহীনতার কারণে এরা নিয়মিত সৌরজগতে আসা-যাওয়া করছে। আকারে ছোট হলেও এদের প্রতিক্রিয়া ভয়ংকর। পৃথিবী ও অন্য গ্রহদের স্থায়ী বিপদের কারণ।

এ বস্তুগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই পৃথিবীর সবগুলো নিউক্লিয়ার অস্ত্রের চেয়েও বেশি ড়্গতিসাধন করতে সড়্গম। যে-কোনো সময় কোনো একটি আঘাত হানতে পারে। সেটা মানুষের জন্যে একটি খারাপ খবরই হবে। সেটা হবে মানব ইতিহাসের একটি আকস্মিক ও নজিরবিহীন প্রতিবন্ধক। কিন্তু পৃথিবীর ড়্গেত্রে এ রকম ঘটনা মোটামুটি নিয়ম মেনে চলে। ধূমকেতু বা গুহাণুর এ মাত্রার সংঘর্ষ গড়ে কয়েক মিলিয়ন১ বছরে একবার ঘটে। অনেকের বিশ্বাস, এ ধরনের এক বা একাধিক ঘটনার ফলেই সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে ডাইনোসররা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পরের বার হয়ত আমাদের পালা।

অনেক ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষেরা আরমাগেডনকে২ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। বাইবেলের বুক *অব রিভিলেশন* পুসত্মকে এ যুদ্ধে সংঘটিত হতাহত এবং ড়্গয়ড়্গতির ভালো একটি বিবরণ দেওয়া আছে। সেটা এ রকম:

এরপর এল বিদ্যুত চমক, বজ্রধ্বনি ও গুড়ুম গুড়ুম শব্দ। সাথে একটি তীব্র ভূমিকম্প। মানুষ পৃথিবীতে পা ফেলার পরে এত বড় ভূমিকম্প আর কখনও আর ঘটেনি। এটা এতই তীব্র ছিল। বিভিন্ন দেশের শহরগুলো ভেঙে পড়ল। দ্বীপগুলো হারিয়ে গেল। দেখা যাচ্ছে না পাহাড়গুলোও। আকাশ থেকে একএকটি একশো পাউন্ড৩ ওজোনোর শিলাবৃষ্টি পড়ল মানুষের মাথা ওপর। শিলাবৃষ্টির প্রকোপে মানুষ ঈশ্বরকে গালাগাল করতে লাগল। প্রকোপটা আসলেই ভয়াবহ ছিল।

অবশ্যই পৃথিবী আরও নানা রকম প্রতিকূল ঘটনার শিকার হতে পারে। বিপুল পরিমাণ বলের বাঁধনে পরিব্যপ্ত মহাবিশ্বের পুঁচকে একটি বস্তু এই পৃথিবী। এত কিছুর পরেও অন্ত্মত সাড়ে তিনশো কোটি বছর ধরে আমাদের গ্রহটি প্রাণ ধারণের উপযোগী হিসেবেই আছে। তবে গ্রহটিতে আমাদের সাফল্যের পেছনে রহস্য কিন্তু মহাকাশই। অনেকভাবেই। বিশাল শূন্যতার মহাসাগরে আমাদের সৌরজগত ড়্গুদ্র একটি সক্রিয় অঞ্চল। আমাদের নিকটতম নড়্গত্রের (সূর্যের পরে) অবস্থান চার আলোকবর্ষ৪ দূরে। এই দূরত্ব কত বেশি সেটা বুঝতে হলে একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে। সূর্য থেকে মাত্র সাড়ে আট মিনিটের মধ্যে আলো নয় কোটি ত্রিশ লড়্গ মাইল পথ পেরিয়ে আসে। চার বছরে তো অতিক্রম করে ২০ ট্রিলিয়ন (২০ লড়্গ কোটি) মাইলেরও বেশি পথ।

সূর্য একটি আদর্শ বামন নড়্গত্র। অবস্থান আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথের (Milky Way galaxy) একটি আদর্শ অঞ্চলে। এ ছায়াপথে নড়্গত্রের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার কোটি। কারও ভর সূর্যের কয়েক শতাংশ। কারও কারও ভর আবার সূর্যের একশো গুণ। এরা ধীরে ধীরে ছায়াপথের কেন্দ্রের চারপাশে ঘুরছে। ঘুরছে ছায়াপথে থাকা প্রচুর পরিমাণ গ্যাসীয় মেঘ ও ধুলো, অজানা সংখ্যক ধূমকেতু ও গ্রহাণু, গ্রহ এবং কৃষ্ণগহ্বরও। এই বিপুল পরিমাণ বস্তুর উপস্থিতির কথা শুনে মনে হতে পারে, ছায়াপথটি বুঝি বিভিন্ন বস্তু দিয়ে কানায় কানায় ভর্তি। এ ধারণা ভুল। আসলে, ছায়াপথটির দৃশ্যমান অংশ প্রায় এক লাখ আলোকবর্ষ পরিমাণ চওড়া। আকৃতি হলো থালার মতো। কেন্দ্রীয় অংশটা একটু স্ফীত। একে ঘিরে ছড়িয়ে আছে কয়েকটি সর্পিল বাহু। বাহুগলো গড়া নড়্গত্র ও গ্যাসীয় পদার্থ দ্বারা। এমনই একটি সর্পিল বাহুতে রয়েছে আমাদের সূর্য। কেন্দ্র থেকে এটি আছে প্রায় ত্রিশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে।

আমরা যতদূর জানি, আকাশগঙ্গা ছায়াপথে খুব ব্যতিক্রমধর্মী কিছুই নেই। একই রকম আরেকটি ছায়াপথ হলো অ্যান্ড্রোমিডা। এটি আছে আমাদের থেকে বিশ লাখ আলোকবর্ষ দূরে। আকাশের অ্যান্ড্রোমিডা তারাম্ললের দিকে এর অবস্থান৫। খালি চোখে একে ঝাপসা ছোপ ছোপ আলোর মতো মনে হয়। বিলিয়ন বিলিয়ন নড়্গত্র সাজিয়ে রেখেছে আমাদের দৃশ্যমান মহাবিশ্ব। কোনোটি সর্পিল, কোনোটি উপবৃত্তাকার, কোনোটি আবার নির্দিষ্ট আকারহীন। দূরত্বের মাপাকাঠি এখানে বিশাল। শক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্যে কয়েক বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের ছায়াপথও আলাদাভাবে দেখা সম্ভব। কোনো কোনো ড়্গেত্রে তো এদের আলো আমাদের কাছে পৌঁছতেই পৃথিবীর বয়সের (সাড়ে চারশো কোটি বছর) চেয়ে বেশি সময় লেগে গেছে।

এই বিশাল স্থানের উপস্থিতির অর্থ হলো মহাকাশে সংঘর্ষের ঘটনা খুব বেশি ঘটে না। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিপদ লুকিয়ে আছে এর আশেপাশেই। গ্রহাণুদের কড়্গপথ সাধারণত পৃথিবীর কাছাকাছি থাকে না। এদেরা বড় অংশই মঙ্গল বৃহস্পতির মাঝখানের গ্রহাণু বেষ্টনীতেই থাকে সব সময়। তবে বৃহস্পতির বিপুল ভর গ্রহাণুদেরকে কড়্গপথ থেকে ছিটকে দিতে পারে। ফলে এদের কোনোটি কোনোটি সূর্যের দিকে চলে আসে। ডেকে আনে পৃথিবীর বিপদ।

আরেকটি বিপদ হলো ধূমকেতু। মনে করা হয়, দর্শনীয় এ বস্তুগলোর উত্পত্তি সূর্য থেকে প্রায় এক আলোকবর্ষ দূরের একটি মেঘপুঞ্জে। এখানে দোষ বৃহস্পতির নয়। দায়ী বরং নিকটস্থ নড়্গত্ররা। ছায়াপথ স্থির বসে নেই। শুধু নড়্গত্রগুলোই ছায়াপথ কেন্দ্রকে প্রদড়্গিণ করছে না, ছায়াপথ নিজেও ধীরে ধীরে আবর্তন করছে। সূর্য তার সঙ্গী গ্রহদেরকে নিয়ে প্রায় ২০ কোটি বছরে ছায়াপথকে পুরো একবার ঘুরে আসে। এ যাত্রাপথে মুখোমুখি হতে হয় নানা রকম অভিজ্ঞতার। নিকটবর্তী নড়্গত্ররা ধূমকেতুর মেঘকে নাড়িয়ে দিতে পারে। কিছু কিছু ধূমকেতু তখন ছিটকে আসবে সূর্যের দিকে। ধূমকেতুরা সৌরজগতের ভেতরের দিকে চলে এলে সূর্যের উত্তাপে এদের উদ্বায়ী পদার্থ বাষ্পীভূত হয়ে যায়। সৌর বায়ুর ধাক্কায় একটি লম্বা প্রবাহ তৈরি হয়। এটাই ধূমকেতুর বিখ্যাত লেজ। সৌরজগতের ভেতরের দিকে চলে এলেও ধূমকেতুর সাথে পৃথিবীর সংঘর্ষ হবার সম্ভাবনা খুব কম। তবে ড়্গতি ধূমকেতুও করে। তবে তার দোষ কিন্তু পড়ে পথে দেখা হওয়া নড়্গত্রের ওপর। তবে আমাদের ভাগ্য ভাল যে নড়্গত্রের মাঝের দূরত্ব অনেক বেশি হওয়ায় এমন ঘটনা খুব বেশি ঘটে না।

ছায়াপথের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে আরও কিছু বস্তু আমাদের দিকে আমাদের দিকে চলে আসতে পারে। যেমন ছায়াপথে ভেসে চলা গ্যাসের বড় বড় মেঘপুঞ্জ। এরা প্রচ্ল চিকন হলেও সৌরবায়ুকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। প্রভাবিত করতে পারে সূর্য থেকে আসা তাপের প্রবাহকে। অন্ধকার মহাশূন্যে আরও নানান ভয়নাক জিনিস লুকিয়ে থাকতে পারে। যেমন, বিচ্ছিন্ন গহ, নিউট্রন নড়্গত্র, বাদামী বামন, কৃষ্ণগহ্বর ইত্যাদি৬। এরাসহ আরও অনেকেই আমাদের অজান্ত্মেই আমাদের দিকে ধেয়ে আসতে পারে। সৌরজগতে ঘটে যেতে পারে টালমাটাল অবস্থা।

বিপদ আরও ভয়াবহও হতে পারে। কোনো কোনো জ্যোতির্বিদ মনে করেন, সূর্য হয়ত একটি দ্বি-তারা৭ জগতের অংশ। আমাদের ছায়াপথের আরও বহু নড়্গত্রের অবস্থাই এমন। সূর্যের প্রসত্মাবিত এই সঙ্গী তারাটির নাম নেমেসিস। তবে এটা আসলেই থেকেও থাকে, এটা অনেক বেশি অনুজ্জ্বল। দূরত্ব অনেক বেশি। এজন্যই এখনও একে খুঁজে পাওয়া যায়নি। সূর্যের চারপাশের কড়্গপথে এর গতি ধীর হলেও মহাকর্ষের মাধ্যমে এটি উপস্থিতির জানান দিতে পারে। মাঝে মাঝে দূরের ধূমকেতুদের গতিপথ পাল্টে পাঠিয়ে দিতে পারে পৃথিবীর দিকে। পরিণতিতে ঘটবে একের পর এক সাংঘাতিক সংঘর্ষ। ভূতাত্ত্বিকেরা দেখেছেন যে নিয়মিত বিরতিতে বড় আকারের বাসত্মগত (ecological) বিপর্যর ঘটে। এটা ঘটে প্রতি ৩০ লাখ বছর পরে একবার।

আরও গভীরভাবে পর্যবেড়্গণ করে জ্যোতির্বিদরা জানলেন, সম্পূর্ণ ছায়াপথরাই সংঘর্ষ বাঁধাতে পারে। আকাশগঙ্গার সাথে আরেকটি ছায়াপথের ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা কেমন? এমন কিছু প্রমাণ অবশ্য আছেই। নড়্গত্রদের দ্রত চলাচল দেখে বোঝা যায়, ইতোমধ্যে আকাশগঙ্গা ছায়াপথ নিকটস্থ ছায়াপথদের সাথে সংঘর্ষ করে নড়েচড়ে বসেছে। তবে নিকটস্থ দুটো ছায়াপথের সংঘর্ষ বাঁধলেই যে ছায়াপথ পরিবারের নড়্গত্রদেরও বিপর্যয় ঘটবে এমন কোনো কথা নেই। ছায়াপথদের ঘনত্ব এত কম যে নড়্গত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ না ঘটিয়েও এরা একে অন্যের সাথে মিশে যেতে পারে।

মহাপ্রলয়ের আলোচনা অধিকাংশ মানুষকে মুগ্ধ করে। তাঁদের কাছে মহাপ্রলয় মানে পৃথিবীর আকস্মিক ও দৃষ্টিকাড়া উপায়ে পৃথিবীর মৃত্যু। তবে ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাওয়ার চেয়ে হঠাত্ মৃত্যুর মধ্যেই বিপদ কম। অনেকগুলো উপায়ে পৃথিবী ধীরে ধীরে বসবাসের অনুপযোগী হয়ে যেতে পারে। যেমন, বাস্তুসংস্থানের ক্রমানবনতি, জলবায়ু পরিবর্তন বা সূর্য থেকে আসা তাপের পরিমাণের একটুখানি তারতম্য। ভঙ্গুর পৃথিবীতে এগুলো যদি আমাদের অসিত্মত্বকে হুমকির মুখে না ফেললেও আরাম-আয়েশের জীবনে ইতি অবশ্যই ঘটাবে। তবে এ ধরনের পরিবর্তন ঘটতে হাজার হাজার বা এমনকি লড়্গ লড়্গ বছরও লেগে যায়। আধুনিক প্রযক্তির সাহায্যে মানুষ হয়ত এগুলোকে প্রতিরোধও করতে পারবে। যেমন, নতুন করে ধীরে ধীরে বরফ যুগের সূচনা হতে থাকলেও আমাদের সম্পূর্ণ বিপর্যয় ঘটবে না। সেটা ঘটার আগে সবকিছু নতুন করে ঢেলে সাজাবার জন্যে যথেষ্ট সময় হাতে থাকবে আমাদের। ধরে নেওয়া যায় যে একবিংশ শতাব্দীতেও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটতে থাকবে। ফলে এটা বিশ্বাসযোগ্য যে মানুষ বা তার বংশধররা ক্রমেই জগতের বড় কাঠামোর নিয়ন্ত্রণ নিতে পারবে। ঠেকাতে পারবে বড় বড় সব দূর্যোগও।

তাত্ত্বিকভাবে কি মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকতে পারে? হয়ত পারে। কিন্তু আমরা দেখব, অমরত্ব অর্জন করা সোজা কথা নয়। হয়ত সেটা অসম্ভবই। মহাবিশ্ব নিজেই ভৌত সূত্রের অধীন। সূত্রগুলোই এর জীবনচক্র বেঁধে দিয়েছে: জন্ম, বিবর্তন, এবং হয়ত মৃত্যু। নড়্গত্রের নিয়তির সাথে আমাদের নিয়তি অনিবার্যভাবে জড়িয়ে আছে।

অনুবাদকের নোট:

1. এক মিলিয়ন সমান দশ লড়্গ
2. বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট অংশ অনুসারে পৃথিবীর শেষের দিকে একটি বড় যুদ্ধ হবে। এ যুদ্ধের ময়দানের সত্যিকার বা প্রতিকি নাম হলো আরমাগেডন।
3. এক পাউন্ড সমান ০.৪৫৩৬ কেজি। মানে, ১০০ পাউন্ড সমান প্রায় ৪৫ কেজি।
4. আলোর এক বছরে অতিক্রান্ত্ম দূরত্ব।
5. অ্যান্ড্রোমিডা একই সাথে একটি ছায়াপথ এবং একটি তারাম্ললের নাম। মহাকাশের বিভিন্ন বস্তুর অবস্থান নির্দিষ্ট করার জন্যে পুরো আকাশের দৃশ্যমান গোলককে ৮৮টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। এর প্রতিটিকে এক একটি তারাম্লল (constellation) বলে।
6. এদের পরিচয় ও পার্থক্য দেখুন পরিশিষ্ট অংশে।
7. বর্তমানে দ্বি-তারা বা ডাবল স্টার বলা হয় এমন দুটো তারাকে যাদেরকে পৃথিবী থেকে দেখতে খুব কাছাকাছি মনে হয়। বাসত্মবে এরা নিজেদের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেও পৃথিবীর আকাশে কাছাকাছি অবস্থানে থাকতে পারে। আবার হতে পারে এরা একে অপর েকেন্দ্র করে ঘুরছে। এই দ্বিতীয় ড়্গেত্রে এদেরকে বাইনারি স্টার বা জোড়া তারা বলে। আলোচ্য অংশে দ্বি-তারা বলতে আসলে জোড়াতারাকে বোঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয় অথ্যায়

মৃত্যুর মুখে মহাবিশ্ব

১৮৫৬ সালের কথা। জার্মান পদার্থবিদ হেরম্যান ভন হেলমহলজ বিজ্ঞানের ইতিহাসের সম্ভবত সবচেয়ে হতাশাজনক অনুমানটি করেন। হেলমহলজ বললেন, মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে মহাবিশ্ব। তাঁর এ অনুমানের ভিত্তি হলো তথাকথিত তাপ গতিবিদ্যার দ্তিতীয় সূত্র। সূত্রটি প্রথম রূপ লাভ করে ঊনবিংশ শতকের শুরম্নর দিকে। উদ্দেশ্যে ছিল তাপ ইঞ্জিনের কর্মদড়্গতার (efficiency) সংজ্ঞা দেওয়া। অল্প দিনের মাথায়ই সূত্রটির বিশ্বজনীন গুরম্নত্ব স্বীকৃতি পেয়ে গেল। (অনেক সময় একে সহজ করে দ্য সেকেন্ড ল্য বা ২য় সূত্রও বলা হয়)। প্রকৃতপড়্গে আড়্গরিক অর্থেই এর গুরম্নত্ব বিশ্বজনীন, তথা সমগ্র মহাবিশ জুড়ে।

সবচেয়ে সহজ কথায় ২য় সূত্রের বক্তব্য হলো, তাপ প্রবাহিত হয় উত্তপ্ত বস্তু থেকে শীতল বস্তুর দিকে। হ্যাঁ, ভৌত পরিবেশের একটি পরিষ্কার ও পরিচিত বৈশিষ্ট্য এটি। খাবার রান্না করতে গেলে বা গরিম কফি ঠা্লা করতে গেলেই সূত্রটির দেখা পাই আমরা। উচ্চ তাপমাত্রার এলাকা থেকে তাপ নিম্ন তাপমাত্রার এলাকার দিকে প্রবাহিত হয়। এতে কোনো রহস্য নেই। পদার্থের অণুর জগতের কম্পনের মাধ্যমে তাপ নিজের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। গ্যাস, যেমন বায়ুর মধ্যে অণুরা এলোমেলোভাবে ছোটাছুটি ও সংঘর্ষ করে। এমনকি কঠিন পদার্থের মধ্যেও পরমাণুরা প্রবলভাবে স্পন্দিত হয়। পদার্থের উষ্ণতা যত বেশি হবে, অণুর কম্পনের প্রাবল্যও তত বেশি হবে। ভিন্ন তাপমাত্রার দুটো বস্তুকে সংস্পর্শে আনা হলে উত্তপ্ত বস্তুটির অধিকতর প্রবল কম্পন অল্প সময়ের মধ্যেই ঠা্লা বস্তুটিতে ছড়িয়ে পড়বে।

চিত্র ২.১

অ্যারো অব টাইম বা সময়ের তীর

বরফের গলন থেকে সময় প্রবাহের দিক সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। তাপ গরম পানি থেকে ঠা্লা বরফের দিকে প্রবাহিত হয়। কোনো মুভিতে যদি ওপরের ছবির ঘটনাটি গ, খ, ক আকারে দেখানো হয়, তবে ভুলটি সহজেই সবার চোখে ধরা পড়বে। এনট্রপি নামে একটি রাশি এ অপ্রতিসাম্যের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। বরফ গললে এর পরিমাণ বাড়ে।

তাপের প্রবাহ যেহেতু একমুখী, তাই প্রক্রিয়াটিতে সময়ের ভারসাম্য নেই। কোনো মুভিতে যদি দেখানো হয় ঠা্লা বস্তু থেকে তাপ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গরম বস্তুতে যাচ্ছে, সেটা খুবই হাস্যকর হবে। একই রকম হাস্যকর হবে নদীর পানি ঢালু বেয়ে উঠে যাচ্ছে বা বৃষ্টির ফোটা মেঘে গিয়ে জমা হচ্ছে দেখানোটা। ফলে আমরা তাপ প্রবাহের একটি মৌলিক দিকমুখিতা দেখতে পাচ্ছি। একে অনেক সময় অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে চিহ্নিত একটি তীরের মাধ্যমে দেখানো হয়। সময়ের এই ‘তীর’ তাপগতীয় প্রক্রিয়ার অপ্রত্যাগামী১ আচরণ প্রকাশ করে। দেড়শ বছর ধরে। (দেখুন চিত্র ২.১)।

তাপগতিবিদ্যার অপ্রত্যাগামী বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার জন্যে এনট্রপি রাশিটি খুব গুরম্নত্বপূর্ণ। এ বিষয়টির স্বীকৃতি মেলে হেলমহলজ, রম্নডলপ ক্লসিয়াস ও লর্ড কেলভিনের কাজের মাধ্যমে। একটি সহজ বিষয় চিন্ত্মা করা যাক। একটি উষ্ণ বস্তু একটি ঠা্লা বস্তুর সংস্পর্শে আছে। এড়্গেত্রে তাপ শক্তি ও তাপমাত্রা েঅনুপাতকে এনট্রপির সংজ্ঞা হিসেবে চিন্ত্মা করা যায়। মনে করম্নন, অল্প পরিমাণ তাপ উষ্ণ বস্তুটি থেকে শীতল বস্তুতে প্রবাহিত হচ্ছে। উষ্ণ বস্তুটি কিছু এনট্রপি\* হারাবে, আর শীতল বস্তুটি কিছু এনট্রপি লাভ করবে। এখানে তাপ শক্তির পরিমাণ একই থাকলেও তাপমাত্রা কিন্তু ভিন্ন ছিল। অত্রএব, উষ্ণ বস্তুটি যতটুকু এনট্রপি হারিয়েছে, শীতল বস্তুটি তার চেয়ে বেশি এনট্রপি লাভ করেছে। ফলে সিস্টেমের মোট এনট্রপি, মানে উষ্ণ ও বস্তু শীতল বস্তুর এনট্রপির সমষ্টি বেড়েছে। তার মানে, তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রকে আরেকভাবেও বলা যায়। এ ধরনের সিস্টেমের\* এনট্রপি কখনও হ্রাস পাবে না। কারণ, সেড়্গেত্রে কিছু পরিমাণ তাপকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শীতল বসত্ম থেকে উষ্ণ বস্তুতে প্রবাহিত হতে হবে।

আরেকটু গভীরভাবে চিন্ত্মা করলে সূত্রটিকে যে-কোনো বদ্ধ সিস্টেমের\* জন্যে প্রয়োগ করা যায়: এনট্রপি কখনোই কমে না। ধরা যাক সিস্টেমে আছে একটি রেফ্রিজারেটর (ফ্রিজ)। এটি শীতল বস্তু থেকে উত্তপ্ত বস্তুতে তাপ পাঠায়। এনট্রপির মোট পরিমাণ হিসেব করতে হলে ফ্রিজ চালানোর জন্যে ব্যয় হওয়া শক্তির কথা মাথায় রাখতে হবে। এই ব্যয়ের প্রক্রিয়ার কারণেই কিছু এনট্রপি বেড়ে যাবে। ফলে সবসময় একই ঘটনা ঘটবে। ফ্রিজ ঠা্লা বস্তুকে গরম করে কিছু এনট্রপি কমাবে ঠিকই, কিন্তু ফ্রিজ চালু রাখতে গিয়ে যে পরিমাণ এনট্রপি বাড়বে সেটা এর চেয়ে ঢের বেশি। প্রাকৃতিক সিস্টেমগুলোতেও একই ঘটনা ঘটে। যেমন, বিভিন্ন জীবের দেহে বা স্ফটিক তৈরির প্রক্রিয়া। সিস্টেমেরে এক অংশের এনট্রপি কমে যায়, কিন্তু অপর কোনো অংশে ঠিকই তার চেয়ে বেশি পরিমাণ এনট্রপি বেড়ে যায়। সব মিলিয়ে, এনট্রপি কখনোই কমে না।

সামগ্রিকভাবে পুরো মহাবিশ্বকে একটি একটি বদ্ধ সিস্টেম ভাবা যায়। এই অর্থে যে, এর ‘বাইরে’ কিছুই নেই। তাহলে, তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র গুরম্নত্বপূর্ণ একটি পূর্বাভাস প্রদান করে। সেটি হলো, মহাবিশ্বের মোট এনট্রপি কখনোই কমে না। আসলে এটি অপ্রতিরোধ্য গতিতে বেড়েই চলে। আমাদের খুব কাছেই তো এর একটি নমুনা আছে। সূর্যের কথা বলছি। সূর্য অবিরাম মহাশূন্যের শীতল অঞ্চলের দিকে তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে। তাপ ছড়িয়ে পড়ছে মহাবিশ্ব জুড়ে। ফিরে আসছে না কখনও। স্পষ্ট একটি অপ্রত্যাগামী প্রক্রিয়া।

ভাবনার বিষয় হলো, এটা কি সম্ভব যে মাহবিশ্বের এনট্রপি চিরকাল বাড়তেই থাকবে। মনে করম্নন, এমন একটি পাত্র নেওয়া হলো, যেখান থেকে কোনো তাপ বের হতে পারে না, আবার কোনো তাপ সেখানে প্রবেশও করতে পারে না। ধরম্নন সেখানে একটি উষ্ণ ও একটি শীতল বস্তুকে পাশাপাশি রাখা হলো। তাপ শক্তি উষ্ণ বস্তু থেকে শীতল বস্তুতে প্রবাহিত হবে। এনট্রপি বাড়বে। কিন্তু এক পর্যায়ে শীতল বস্তুটি গরম হবে এবং উষ্ণ বস্তুটি ঠা্লা হবে। ফলে দুটোর তাপমাত্রা সমান হয়ে যাবে। এ অবস্থায় পৌঁছার আর কোনো তাপ বিনিময় হবে না। পাত্রের ভিতরের সিস্টেম একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পৌঁছবে। সর্বোচ্চ এনট্রপির এই সুস্থিত দশাকে তাপগতীয় সাম্যাবস্থা বলে। সিস্টেমটি বিচ্ছিন্ন থাকলে আর কোনো পরিবর্তন হওয়ার কথা নয়। কিন্তু বস্তুগুলোকে কোনোভাবে প্রভাবিত করলে ভিন্ন কথা। যেমন ধরম্নন, পাত্রের বাইরে থেকে আরও তাপ সরবরাহ করা হলো। সেড়্গেত্রে তাপীয় ঘটনা আরও ঘটবে। এবং এনট্রপির সর্বোচ্চ সীমা আরেকটু বাড়বে।

মহাবিশ্বের পরিবর্তন সম্পর্কে তাপগতিবিদ্যার এ সূত্রগুলোর বক্তব্য কী? সূর্য এবং অধিকাংশ নড়্গত্রের কথা যদি বলি, তাপ নির্গমনের প্রক্রিয়া আরও বহু বিলিয়ণ বছর ধরে চলতে পারে। কিন্তু এর যে শেষ নেই তা নয়। একটি সাধারণ নড়্গত্রের তাপ উত্পন্ন হয় এর অভ্যন্ত্মরে সংঘটিত নিউক্লিয়ার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। পরে আমরা দেখব, সূর্যের জ্তালানি এক সময় ফুরিয়ে যাবে। এবং সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এক সময় এর তাপমাত্রা এর পাশ্ববর্তী মহাশূন্যের তাপমাত্রার সমান হয়ে যাবে।

হেরম্যান ভন হেলমহলজ অবশ্য নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার কথা জানতেন না। (সূর্য এত বিপুল শক্তি কীভাবে উত্পন্ন করে তা তাঁর সময়ে অজানা ছিল) তবে তিনি একটির সার্বিক নীতি তাঁর জানা হয়ে গিয়েছিল। সেটা হলো, মহাবিশ্বের সকল ভৌত প্রক্রিয়া একটি চূড়ান্ত্ম তাপগতীয় সাম্যাবস্থা বা সর্বোচ্চ এনট্রপির দিকে এগোচ্ছে। তার পরে আর কোনো দিন বলার মতো কিছু ঘটার সম্ভাবনা নেই। প্রথম দিকের বিশেষজ্ঞরা সাম্যাবস্থার দিকের এই একমুখী গতিকে নাম দেন ‘তাপীয় মৃত্যু’ (heat death)। তবে সবাই মানতেন যে বাইরে থেকে কাজ করে স্বতন্ত্র সিস্টেমকে আবার সক্রিয় করা যেতে পারে। কিন্তু সংজ্ঞা অনুসারেই মহাবিশ্বের ‘বাইরে’ কিছুই নেই। ফলে, সামগ্রিক সেই তাপীয় মৃত্যু ঠেকানোর মতো কিছুই নেই। অনিবার্য এক পরিণতি।

তাপগতিবিদ্যার সূত্রের কারণে মহাবিশ্ব অপ্রতিরোধ্যভাবে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এ আবিষ্কার বহু প্রজন্মের বিজ্ঞানী ও দার্শনিককে হতাশ করেছে। যেমন বার্টান্ড রাসেল তাঁর হোয়াই *আই অ্যাম নট অ্যা ক্রিশ্চিয়ান* বইয়ে নিজের বিষণ্ন মনোভাব তুলে ধরতে গিয়ে বলেন,

‘যুগের পর যুগ ধরে করে যাওয়া এত সব পরিশ্রম, এত ঐকান্ত্মিকতা, এত সব উত্সাহ-উদ্দীপনা, মানুষের বুদ্ধিমত্ত্বার এত দারম্নণ সব নিদর্শন সৌরজগতের মৃত্যুর সাথে সাথে হারিয়ে যাবে, আর মানুষের সকল অর্জন অনিবার্যভাবে মহাবিশ্বের ধ্বংসাবশেষের নিচে চাপা পড়বে — এ কথাগুলোর সাথে সবাই একমত না হলেও এর বিপড়্গ কোনো দর্শন প্রয়োগ করেও এর থেকে বাঁচার আশা করা যেতে পারে না। শুধু এই সত্যের ওপর ভর করেই, এই কঠিন হতাশার ওপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থেকেই আত্মাকে নিরাপদ করা যেতে পারে।’

তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র ও এর মরণোন্মুখ মহাবিশ্বর বিষয়ক ফলাফল সম্পর্কে অনেকই মন্ত্মব্য করেছেন, মহাবিশ্ব আসলে নিরর্থক জিনিস। এবং চূড়ান্ত্মভাবে মানুষের অসিত্মত্বও অর্থহীন। এই হতাশাব্যঞ্জক মন্ত্মব্য সম্পর্কে আমি পরের অধ্যায়গুলোতে কথা বলব। এই ধারণা ঠিক কি ভুল সেটাও আলোচনা করব।

মহাবিশ্বের চূড়ান্ত্ম তাপীয় মৃত্যু যে কেবল ভবিষ্যত্ মহাবিশ্বের কথাই বলছে তা কিন্তু নয়, অতীতের ওপরও ভূমিকা আছে এর। এটা পরিষ্কার যে মহাবিশ্ব যদি একটি নির্দিষ্ট হারে নিঃশেষ হয়ে যেতে থাকে, তবে এর চিরকাল ধরে এর পড়্গে টিকে থাকা অসম্ভব। কারণটা খুব সোজা। মহাবিশ্বের বংষ যদি অসীম হত, তবে এত দিনে এর মৃত্যুই হয়ে যেত। যে জিনিস নির্দিষ্ট হারে শেষ হয়ে যেথে থাকে সেটার পড়্গে চিরকাল টিকে থাকা সম্ভব নয়। অন্য কথায়, অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট সময় আগে মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছে।

একটা বড় বিষয় হলো, ঊনবিংশ শতকের বিজ্ঞানীরা এই বড় ফলাফলটি ভালোমতো বুঝতে পারেননি। ১৯২০ এর দশকে মহাকাশ পর্যড়্গেণের মাধ্যমে বোঝা গেল, আকস্মিক এক মহাবিস্ফোরণের (বিগ ব্যাং) এর মাধ্যমে জন্ম হয়েছে মহাবিশ্বের। তবে দেখা যাচ্ছে, শুধু তাপগতীয় কারণের ওপর ভিত্তি করেই মহাবিশ্বের একটি নির্দিষ্ট সময়ে শুরম্নর বিষয়ে আগে থেকেই দৃঢ় সমর্থন ছিল।

চিত্র ২.২

ওলবার্স প্যারাডক্স

মনে করম্নন, মহাবিশ্ব অপরিবর্তনশীল। নড়্গত্রগুলো নির্দিষ্ট একটি গড় ঘনত্ব নিয়ে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। চিত্রে পৃথিবীর চরাদিকের একটি চিকন গোলাকীয় খোলসের মধ্যে অবস্থিত নড়্গত্রদের কিছু নড়্গত্র দেখানো হলো। (খোলসের বাইরের নড়্গত্রগুলো চিত্র থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।) এ খোলসের নড়্গত্রগুলো থেকে আসা আলোই পৃথিবীতে পতিত সমসত্ম নাড়্গত্রিক আলোর যোগান দেয়। একটি নির্দিষ্ট নড়্গত্র থেকে আসা আলো এর খোলসের ব্যাসার্ধের বর্গ অনুপাতে\* কমে যায়। আবার, খোলসের ব্যাসার্ধ বাড়ার সাথে সাথে নড়্গত্রের সংখ্যাও বেড়ে যায় বর্গ অনুপাতেই। ফলে দুটো প্রভাব একে অপরকে বাতিল করে দেয়। তার মানে, খোলসের মোট দীপ্তি\* এর ব্যাসার্ধের ওপর নির্ভর করে না। মহাবিশ্ব অসীম হলে এতে এরকম খোলসের সংখ্যাও অসীম হবে। ফলে, পৃথিবীর বুকে এসে পতিত আলোর পরিমাণও অসীম হবার কথা।

কিন্তু বাসত্মবে এমনটা দেখা যায়নি বলে ঊনবিংশ শতকের জ্যোতির্িবদদেরকে মহাবিশ্ব একটি আগ্রহোদ্দীপক প্যারাডক্স হতবুদ্ধিতে ফেলে দেয়। জার্মান জ্যোতির্বিদ ওলবারের নাম অনুসারে একে ওলবারস প্যারাডক্স বলে ডাকা হয়। তিনিই প্যারাডক্সটির জন্ম দেন। এটি একটি সরল কিন্তু খুব গুরম্নত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে। রাতের আকাশ কেন কালো?

প্রথম দৃষ্টিতে একে ছোটখাটো সমস্যা মনে হবে। রাতের আকাশ কালো, কারণ নড়্গত্ররা আমাদের থেকে অনেক অনেক দূরে আছে। তাই এরা অনুজ্জল। (দেখুন চিত্র ২.২) কিন্তু ধরম্নন, মহাশূন্যের কোনো শেষ নেই। সেড়্গেত্রে নড়্গত্রের সংখ্যা অসীম হতে তো কোনো বাধা নেই। অসীম সংখ্যক অুনজ্জ্বল নড়্গত্রের আলোও একত্র করলেও তো প্রচুর আলো হয়। মহাশূন্যে প্রায় সুষমভাবে (সমান এলাকায় প্রায় সমান সংখ্যক) বিন্যসত্ম অসীম সংখ্যক অপরিবর্তনশীল নড়্গত্রের মোট আলোর পরিমাণ সহজেই হিসেব করে বের করা যায়। বিপরীত বর্গীয়\* সূত্র অনুসারে দূরত্বের সাথে সাথে উজ্জ্তলতা কমে আসে। এর মানে হলো, দূরত্ব দ্বিগুণ হলে উজ্জ্তলতা চার ভাগের এক ভাগ হয়ে যাবে। দূরত্ব তিন গুণ হলে উজ্জ্বলতা হবে নয় ভাগের এক ভাগ। এভাবেই চলতে থাকবে। অন্য দিকে যত দূর পর্যন্ত্ম দৃষ্টি দেওয়া হবে, নড়্গত্রের সংখ্যা তত বাড়তে থাকবে। এবং, সাধারণ জ্যামিতির মাধ্যমেই দেখানো যায়, একশ আলেকবর্ষ দূরে যত নড়্গত্র আছে, দুইশ আলোকবর্ষ দূরে তার চার গুণ নড়্গত্র আছে। আবার, একশ আলেকবর্ষ দূরে যত নড়্গত্র আছে, তিনশ আলোকবর্ষ দূরে আছে তার নয় গুণ নড়্গত্র। তার মানে, দূরত্বের বর্গের সমানুপাতে নড়্গত্রের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে আর উজ্জ্বলতা কমে যাচ্ছে। দুটো প্রভাব একে অপরকে বাতিল করে দিচ্ছে। তার অর্থ হলো, একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থিত সবগুলো নড়্গত্র থেকে মোট কী পরিমাণ আলো আসবে তা দূরত্বের ওপর নির্ভরশীল নয়। দুইশ আলোকবর্ষ দূরের নড়্গত্ররা যতটুকু আলো দেবে, একশ আলোকবর্ষের দূরের নড়্গত্ররাও সেই একই পরিমাণ আলো দেবে।

সমস্যা হয় যখন আমরা সম্ভাব্য সকল দূরত্বের সকল নড়্গত্রের আলো একত্র করি। মহাবিশ্বের যদি কোনো সীমানা না থাকে, তাহলে তো মনে হয় পৃথিবীতে এসে পড়া আলোর মোট পরিমাণের কোনো সীমা থাকবে না। অন্ধকার হওয়া তো দূরের কথা, রাতের আকাশ তীব্র আলোতে ঝলমল করার কথা।

নড়্গত্রদের সসীম সাইজের কথা মাথায় রাখলে সমস্যাটি আরও বড় হয়ে দেখা দেয়। পৃথিবী থেকে কোনো নড়্গত্র যত দূরে থাকবে, এর আপাত সাইজও তত কম হবে। পৃথিবী থেকে দেখতে দুটো নড়্গত্র একই রেখা বরাবর হলে কাছের কোনো নড়্গত্রের অপেড়্গাকৃত দূরের নড়্গত্রকে আড়াল করে ফেলবে। মহাবিশ্ব অসীম হলে এটা ঘটবে অসীম সয়ংখ্যক বার। এটাকে হিসাবে ধরলে আগের সিদ্ধান্ত্ম কিন্তু পাল্টে যাবে। পৃথিবীতে এতে পৌঁছা আলো অনেক বেশি হবে এটা ঠিক, কিন্তু সেটা অসীম হবে না। পৃথিবী সৌরপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০ লাখ মাইল দূরে থাকলে পৃথিবীর আকাশে যে পরিমাণ আলো আসত এটা প্রায় তার সমান হবে। এ রকম অবস্থান অবশ্যই খুব অস্বসিত্মকর হবে। বস্তুত, তীব্র উত্তাপে পৃথিবী নিমেষের মধ্যেই বাষ্পীভূত হয়ে যেত।

অসীম মহাবিশ্ব যে আসলে একটি মহাজাগতিক চুলিস্নর মতো আচরণ করবে এ ধারণা নতুন কিছু নয়। এটা আর আগে আলোচিত তাপগতীয় সমস্যা আসলে একই কথা। নড়্গত্ররা মহাশূন্যে তাপ ও আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই বিকিরণ\* ক্রমশ জমা হচ্ছে মহাশূন্যে। যদি নড়্গত্রগুলো অসীম সময় ধরে জ্তলে, তাহলে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় বিকিরণের তীব্রতা অসীম হবে। কিন্তু মহাশূন্য দিয়ে সঞ্চালিত হবার সময় কিছু বিকিরণ অন্য নড়্গত্রের ওপর গিয়ে পড়ে পুনঃশোষিত হবে। (আমরা যে দেখি নিকটবর্তী তারকারা দূরের তারকাদের আলো আড়াল করে রাখে, এটা সেই একই কথা।) ফলে বিকিরণের তীব্রতা বেড়ে চলবে। এটা চলবে একটি সাম্যাবস্থা অর্জিত হওয়া পর্যন্ত্ম। এ অবস্থায় নির্গমন ও শোষণের হার সমান হয়ে যাবে। এই তাপগতীয় সাম্যাবস্থা অর্জিত হবে তখনি, যখন মহাশূন্য বিকিরণের তাপমাত্রা নড়্গত্রের পৃষ্ঠ তাপমাত্রার সমান হয়ে যাবে। এ তাপমাত্রা হলো কয়েক হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফলে সমগ্র মহাবিশ্ব তাপীয় বিকিরণে পরিপূর্ণ হওয়া উচিত্। যার তাপমাত্রা হবে কয়েক হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস। এবং রাতের আকাশ অন্ধকার হওয়া তো দূরের কথা, তাপমাত্রায় বরং জ্ঝলজ্তল করার কথা।

নিজের প্যারাডক্সের সমাধান দেওয়ার চেষ্টা হেনরিখ ওলবার্স নিজেও করেছিলেন। মহাবিশ্ব বিপুল পরিমাণ ধুলিকণায় ভর্তি। তিনি বললেন, এ পদার্থগুলো নড়্গত্রের বেশির ভাগ আলো শোষণ করে নেয় বলেই (রাতের) আকাশ কালো হয়। দূর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, তাঁর বুদ্ধিটা যথেষ্ট সৃজনশীল হলেও এর মধ্যে ছিল মৌলিক ত্রম্নটি। ধুলিকণাগুলো শেষপর্যন্ত্ম উত্তপ্ত হবে এবং জ্তলতে শুরম্ন করবে। যে পরিমাণ বিকিরণ এরা শোষণ করেছিল, ঠিক সে মাত্রার তীব্রতায়ই জ্তলবে এরা।

আরেকটি সম্ভাব্য সমাধান হলো, মহাবিশ্বের আকার অসীম— এ অনুমান বাদ দিতে হবে। মনে করম্নন নড়্গত্রের সংখ্যা অনেক বেশি হলেও নির্দিষ্ট। তার মানে, মহাবিশ্বে আছে বিপুর পরিমাণ নড়্গত্র আর অসীম অন্ধকার মহাশূন্য। তাহলে নড়্গত্রের বেশিরভাগ আলোই দূর মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে হারিয়ে যাবে। কিন্তু এই সরল সমাধানেও ছিল মারাত্মক ভুল। সতের শতকে আইজ্যাক নিউটনও এ সমস্যার কথা জানতেন। সমস্যাটির সাথে মহাকর্ষ সূত্রের সম্পর্ক আছে। প্রতিটি নড়্গত্রই অপর নড়্গত্রগুলোকে মহাকর্ষ বলের মাধ্যমে আকর্ষণ করছে। ফলে সবগুলো নড়্গত্র একে অপরের দিকে ধাবিত হবে। শেষ পর্যন্ত্ম এসে জড় হবে তাদের মহাকর্ষ কেন্দ্রে। যদি মহাবিশ্বের একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও প্রান্ত্ম থাকে, তবে মনে হচ্ছে এটি নিজের ওপরই গুটিয়ে যাবে। একটি অবলম্বনহীন, সসীম ও স্থির মহাবিশ্ব হবে অস্থিতিশীল। মহাকর্ষের প্রভাবে শেষ পর্যন্ত্ম এটি সংকুচিত হয়ে যাবে।

মহাকর্সের সমস্যার কথা পরে আরও বলব। এখানে শুধু বলব নিউটন কী দারম্নণ উপায়ে এ সমস্যাটি দূর করতে চেয়েছিলেন। নিউটন বললেন, মহাবিশ্বের পড়্গে এর মহাকর্ষ কেন্দ্রের দিকে গুটিয়ে যাওয়া সম্ভব হতে হলে তো আগে এর মহাকর্ষ কেন্দ্র বলতে কিছু থাকতে হবে। মহাবিশ্বের কেন্দ্র ও প্রান্ত্ম না থাকতে হলো একই সাথে দুটো শর্ত পূরণ হতে হয়। মহাবিশ্বকে অসীম হতে হবে এবং নড়্গত্ররা (গড়ে) সুষমভাবে বিন্যসত্ম হতে হবে। একটি নড়্গত্র এর প্রতিবেশী নড়্গত্রগুলো দ্বারা সব দিক থেকে আকর্ষণ অনুভব করবে। বিশাল এক দড়ি টানাটানি খেলার মতো, যেখানে দড়ি সবদিকেই টান অনুভব করে। সবদিকের টানগুলো গড়ে একে অপরকে বাতিল করে দেবে। ফলে, নড়্গত্রটির কোনো নড়চড় হবে না।

ফলে, মহাবিশ্বের গুটিয়ে যাওয়ার সমস্যা এড়াতে নিউটনের সমাধান মেনে নিতে গেলে আবারও অসীম মহাবিশ্বের কথা চলে আসে। ওলবার্সের প্যারাডক্সও হাজির। দেখা যাচ্ছে, আমাদেরকে যে-কোনো একটিকে মেনে নিতেই হবে। কিন্তু একটু পেছনে ফিরে তাকালে আমরা একটি উপায় খুঁজে পাই। এখানে মহাবিশ্বকে অসীম ধরতে হবে না। ভুল অনুমান এটা নয় যে মহাবিশ্ব স্থানের দিক দিয়ে অসীম, বরং ভুল অনুমান হলো মহাবিশ্ব সময়ের দিক দিয়ে অসীম। জ্তলজ্তলে আকাশের প্যারাডক্স তৈরি হয়েছে, কারণ জ্যোতির্বিদরা ধরে নিয়েছিলেন, মহাবিশ্ব অপরিবর্তনশীল। ধরে নিয়েছিলেন, নড়্গত্ররা স্থির এবং এদের বিকিরণের তীব্রতায় কখনও ভাটা পড়ে না। কিন্তু এখন আমরা জানি, এ দুটো অনুমানই ভুল ছিল। প্রথমত, মহাবিশ্ব স্থির নয়, বরং প্রসারিত হচ্ছে। একটু পরই এটা আমি ব্যাখ্যা করব। দ্বিতীয়ত, নড়্গত্ররা চিরকাল আলো দিয়ে যেত পারে না। এক সময় এদের জ্তালানি ফুরিয়ে যায়। এখন নড়্গররা জ্তলছে। তার মানে, অতীতের নিদির্িষ্ট একটি সময় আগে তাদের জন্ম হয়েছিল।

মহাবিশ্বের বয়স নির্দিষ্ট হলে ওলবার্সের প্যারাডক্স সমাধান হয়ে যায়। সেটা কেন হয় বুঝতে হলে একটি দূরের নড়্গত্রের কথা ভাবুন। আলো চলে নির্দিষ্ট গতিতে (শূন্য মাধ্যমে সেকেন্ডে ৩ লাখ কিলোমিটার)। ফলে, আমরা একটি নড়্গত্র এখন যে অবস্থায় আছে আমরা সেটা দেখছি না। দেখছি এটি যখন আলো ছেড়েছিল সে সময়কার অবস্থা। যেমন বেটেলজিউস (আর্দ্রা) নড়্গত্রটি আমাদের থেকে ৬৫০ আলোকবর্ষ দূরে আছে। ফলে একে আমরা যেমন এখন যেমনটা দেখছি সেটা এর ৬৫০ বছর আগের চেহারা। মনে করম্নন, মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছে দশ বিলিয়ন বছর আগে। এড়্গেত্রে আমরা পৃথিবী থেকে ১০ বিলিয়ন আলোকবর্ষের চেয়ে বেশি দূরের কোনো নড়্গত্র দেখব না। স্থানের হিসেবে মহাবিশ্ব অসীম হতেই পারে। কিন্তু এর বয়স যদি নির্দিষ্ট হয়, তাহলে আমরা কোনোভাবেই একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের বাইরে দেখতে পাব না। ফলে, নির্দিষ্ট বয়সের অসীম সংখ্যক নড়্গত্রের মিলিত আলোও নির্দিষ্টই হবে। এবং খুব সম্ভব সেটা হবে অতি নগণ্য।

তাপগতীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও একই ফলাফল পাওয়া যায়। মহাশূন্যকে তাপীয় বিকিরণ দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়ে একই তাপমাত্রায় নিয়ে আসার জন্যে নড়্গত্রদের অসীম সময়ের প্রয়োজন। কারণ, মহাবিশ্বে শূন্য স্থানের পরিমাণ তো বিশাল। তাপগতীয় সাম্যাবস্থায় পৌঁছার জন্যে প্রয়োজনীয় সময় মহাবিশ্বের জন্মের পর থেকে এখনও অতিবাহিত হয়নি।

সবগুলো প্রমাণ বলছে একটি কথাই। মহাবিশ্বের বয়স নির্দিষ্ট। অতীতের নির্দিষ্ট কোনো সময়ে এর জন্ম হয়েছে। বর্তমানে এটি বেশ সক্রিয় হলেও ভবিষ্যতের নির্দিষ্ট কোনো দিন অনিবার্যভাবে একে বরণ করতে হবে তাপীয় মৃত্যু। সাথে সাথে তৈরি হয় অনেকগুলো প্রশ্ন। কখন ঘটবে শেষ পরিণতি? সেটা কেমন হবে? সেটা কি ধীরে ধীরে হবে, নাকি হঠাত্ করে হবে? এটা ভাবা ঠিক হবে কি না যে তাপীয় মৃত্যু বলতে বিজ্ঞানীর এখন যা বোঝেন, কোনোভাবে সেটা ভুল হয়ে যাবে?

অনুবাদকের নোট:

1. যে প্রক্রিয়া শুধু একদিকেই চলে, পেছন দিকে ফিরে আসে না, সেটাই অপ্রত্যাগামী প্রক্রিয়া।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম তিনি মিনিট

ইতিহাসবিদদের মতো কসমোলজিস্টরাও জানেন, ভবিষ্যত জানতে হলে তাকাতে হয় অতীতের দিকে। আগের অধ্যায়ে আমি ব্যাখ্যা করেছি, কীভাবে তাপগতিবিদ্যার সূত্র মহাবিশ্বের নির্দিষ্ট বয়সের ইঙ্গিত দিচ্ছে। প্রায় সকল বিজ্ঞানী একমত যে প্রায় দশ থেকে বিশ বিলিয়ন বছর আগে একটি বৃহত্ বিস্ফোরণের (বিগ ব্যাং) এর মাধ্যমে মহাবিশ্বের জন্ম। এবং মহাবিশ্বের ভবিষ্যত্ নিয়তি কী হবে সেটাও ঠিক হয়ে গেছে এই ঘটনার সাথে সাথে। মহাবিশ্বের শুরম্ন কী করে হয়েছিল এবং প্রাথমিক দশায় এটি কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়েছিল সেটা জেনে ভবিষ্যত্ সম্পর্কে ভালো ধারণা পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতিরি একটি মৌলিক অংশ হলো মহাবিশ্ব চিরকাল ছিল না। গ্রিক দার্শনিকরা চিরন্ত্মন মহাবিশ্বের কথা বললেও পাশ্চাত্যের সবগুলো বড় ধর্মই বলেছে, ঈশ্বর অতীতের নির্দিষ্ট কোনো সময়েই মহাবিশ্ব তৈরি করেছেন।

মহাবিশ্বের আকস্মিক সূচনা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ খুবই জোরালো। সবচেয়ে প্রত্যড়্গ প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল দূরবর্তী ছায়াপথগুলো থেকে আসা আলোর আচরণ বিশেস্নষণ করে। ১৯২০ এর দশকে অ্যামেরিকান জ্যোতির্বিদ এডউইন হাবল পর্যবেড়্গণ করে দেখলেন, দূরবর্তী ছায়াপথগুলো থেকে আসা আলো নিকটবর্তীদের তুলনায় কিছুটা লাল হয়ে যাচ্ছে। তাঁর আগে ভেস্টো সিস্নপার নামে একজন নেবুলা বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে দীর্ঘ দিন ধরে কাজ করে গিয়েছিলেন। কাজ করতেন অ্যারিজোনার ফ্ল্যাগস্ট্যাফ মানমন্দিরে (observatory)। আর হাবল ব্যবহার করেছিলেন ১০০ ইঞ্চির মাউন্ট উইলসন টেলিস্কোপ। এরপর যত্নের সাথে লাল হয়ে যাওয়ার পরিমাণ পরমািপ করলেন ও গ্রাফে আঁঁকলেন। দেখলেন, এখানে একটি নিয়ম কাজ করছে। যে ছায়াপথ আমাদের থেকে যত দূরে আছে, তাকে তত বেশি লাল দেখাচ্ছে।

আলোর রং এর তরঙ্গদৈর্ঘের সাথে সম্পর্কিত। সাদা আলোর বর্ণালিতে\* নীল রং এর অবস্থান ছোট তরঙ্গদৈর্ঘের প্রান্ত্মে আর লাল এর অবস্থান হলো লম্বা তরঙ্গদৈর্ঘের প্রান্ত্মে। যেহেতু দূরের ছায়াপথগুলোর আলো লাল হয়ে যাচ্ছে, তার মানে তাদের আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কোনোভাবে লম্বা হয়ে যাচ্ছে। হাবল খুব যত্নের সাথে অনেকগুলো ছায়াপথের বর্ণালির বৈশিষ্ট্যসূচক রেখার অবস্থান চিহ্নিত করে এ আচরণ সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন। তিনি বললেন, আলোক তরঙ্গ বড় হয়ে যাবার কারণ হলো মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। অতি গুরম্নত্বপূূর্ণ এ বক্তব্যের মাধ্যমেই হাবল আধুনিক কসমোলজির সূচনা করলেন।

সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের ধারণা অনেকইে ঠিকভাবে বুঝতে পারেন না। পৃথিবী থেকে দেখলে মনে হয়, দূরের সব ছায়াপথ আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্রে আছে। প্রসারণের প্রকৃতি পুরো মহাবিশ্ব জুড়ে (গড়ে) একই রকম। প্রতিটি ছায়াপথ, বা আরো ভালোভাবে বললে প্রতিটি ছায়াপথপুঞ্জ**\* বা** সত্মবক (cluster of galaxies) একে অপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এ চিত্র ভালোভাবে বোঝার জন্যে ছায়াপথপুঞ্জগুলো মহাশূন্য দিয়ে ছুটে যাচ্ছে — এভাবে চিন্ত্মা না করে মনে করম্নন, ছায়াপথপুঞ্জের মধ্যবর্তী স্থান ফুলে উঠছে বা লম্বা হয়ে যাচ্ছে।

স্থান প্রসারিত হচ্ছে– কথাটি বিস্ময়কর শোনাতে পারে। কিন্তু ১৯১৫ সালে আইনস্টাইন তাঁর সার্বিক আপিড়্গকতা তত্ত্ব প্রকাশের পর থেকেই বিজ্ঞানীরা এ ধারণার সাথে পরিচিত। এ তত্ত্ব অনুসারে মহাকর্ষ আসলে স্থানের (সঠিক করে বললে স্থানকালের) বক্রতা বা বিকৃতির বহিঃপ্রকাশ। এক অর্থে স্থান হলো স্থিতিস্থাপক**\*।** এটি এর মাঝে উপস্থিত পদার্থের মহাকর্ষীয় ধর্মের ওপর ভিত্তি করে বেেঁক যেতে বা প্রসারিত হতে পারে। পর্যবেড়্গণ থেকে এ ধারণার পড়্গে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

চিত্র ৩.১

সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের একটি একমাত্রিক নমুনা। বিন্দুগুলো দ্বারা ছায়াপথপুঞ্জ নির্দেশ করা হচ্ছে। আর স্থিতিস্থাপক সুতা দিয়ে স্থান বোঝানো হয়েছে। সুতাকে লম্বা করা হলে বিন্দুগুলো দূরে সরে। এর ফলে সুতার ওপর দিয়ে চলমান কোনো তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্যও বড় হবে। হাবলের আবিষ্কৃত লোহিত সরণও**\* এভাবেই** কাজ করে।

একটি সাধারণ উদাহরণের মাধ্যমে সম্প্রসারণশীল স্থানের মৌলিক ধারণা বুঝে নেওয়া যায়। মনে করম্নন, একটি স্থিতিস্থাপক সুতার ওপর অনেকগুলো বিন্দু আছে (দেখুন চিত্র ৩.১)। বিন্দুগলো দ্বারা ছায়াপথপুঞ্জ নির্দেশ করা হচ্ছে। এবার মনে করম্নন, আপনি সুতাটিকে দুই প্রান্ত্ম থেকে ধরে টান দিয়ে লম্বা করে ফেললেন। প্রতিটি বিন্দু একে অপরটি থেকে সরে যাচ্ছে। আপনি যে বিন্দুর কথাই চিন্ত্মা করম্নন না কেন, তার পাশের বিন্দুগুলোকে দূরে সরতে দেখা যাচ্ছে। তার ওপর প্রসারণ সব দিকে একই রকম। কোনো বিশেষ কেন্দ্র বলতে কিছু নেই। অবশ্য আমি এটাকে এখানে যেভাবে এঁকেছি, তাতে একটি বিন্দু কেন্দ্রে আছে। কিন্তু যে প্রক্রিয়ায় এখানে প্রসারণ ঘটছে, তার সাথে এই কেন্দ্রীয় বিন্দুর কোনো সম্পর্ক নেই। বিন্দুসহ সুতাটি যদি অসীম সাইজের হতো অথবা সুতাটি যদি বৃত্তাকার হতো, তবে এই কেন্দ্রটি আর থাকতো না।

যে-কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে চিন্ত্মা করলে দেখা যায়, তার নিকটতম বিন্দুগুলো পরের নিকট বিন্দুগুলো থেকে অর্ধেক গতিতে দূরে সরছে। এবং তারও পরের নিকট বিন্দুগলো থেকে আরও অর্ধেক গতিতে সরছে। এভাবেই চলছে। একটি বিন্দু যত দূরে আছে, সেটি তত দ্রম্নত সরে যাচ্ছে। এ ধরনের প্রসারণের ড়্গেত্রে সরণের**\* হার** দূরত্বের সমানুপাতিক**\* ।** সম্পর্কটা বেশ শক্তিশালী। ছবিটি দেখে আমরা সম্প্রসারণশীল স্থানে বিন্দুগুলো, মানে ছায়াপথপুঞ্জের মধ্যবর্তী স্থানে চলাচলরত আলোক তরঙ্গর কথা কল্পনা করতে পারি। স্থানের সাথে সাথে তরঙ্গও প্রসারিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে মহাজাগতিক লোহিত সরণের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। হাবল দেখলেন, লোহিত সরণের পরিমাণ দূরত্বের সমানুপাতিক। ঠিক ছবিতে যেমনটা দেখানো হয়েছে সেভাবে।

মহাবিশ্ব যদি সম্প্রসারণশীল হয়েই থাকে, তাহলে অতীতে নিশ্চয়ই এটি আরও জড়সড় ছিল। হাবলের পর্যবেড়্গণ থেকে প্রসারণের হার পরিমাপ করা যায়। পরবর্তীতে পর্যবেড়্গণের মান আরও অনেক উন্নত হয়। হারও বের করা হয় আরও ভালোভাবে। মহাজাগতিক চিত্রটিকে পেছনের দিকে চালিয়ে দিলে আমরা দেখব, কোনো এক দূর অতীতে সবগুলো ছায়াপথ একে অপরের সাথে মিশে আছে। বর্তমান সময়ের প্রসারণের হার জেনে আমরা অনুমান করতে পারি যে এই মিশ্রিত অবস্থা বহু বিলিয়ন বছর আগের কথা। তবে দুটি কারণে সেই সময়টি সঠিক করে বলা সম্ভব নয়। প্রথমত, বিভিন্ন কারণে সঠিক করে পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। বিভিন্নভাবে ভুল হয়েই যায়। অবশ্য আধুনিক টেলিস্কোপের মাধ্যমে আগের চেয়ে বেশি সংখ্যক ছায়াপথ নিয়ে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু এর পরেও প্রসারণের হার এখনও অনিশ্চিত। সেটা কমপড়্গে দুই গুণ পর্যন্ত্ম কম-বেশি হতে পারে। এটা এখনও বিতর্কের বড় একটি বিষয়।

দ্বিতীয়ত, মহাবিশ্বের প্রসারণ হার সব সময় একই থাকে না। এর জন্যে দায়ী হলো মহাকর্ষ বল। মহাকর্ষ বল ছায়াপথগুলোর মধ্যে তো কাজ করেই, এটা কাজ করে মহাবিশ্বের সব ধরনের পদার্থ এবং শক্তির মধ্যেও। মহাকর্ষ ব্রেকের মতো আচরণ করে। এর কারণে ছায়াপথগুলো বাইরের দিকে ছুটে যেতে বাধা পায়। ফলে, সময়ের সাথে সাথে প্রসারণ হার ধীরে ধীরে কমে আসে। তার মানে, অতীতে নিশ্চয়ই মহাবিশ্ব আরও দ্রম্নত প্রসারিত হচ্ছিল। গ্রাফে যদি সময়ের বিপরীতে মহাবিশ্বের একটি আদর্শ এলাকার সাইজ দেখানো হয়, তাহলে ৩.২ নং চিত্রের মতো একটি সাধারণ রেখা পাওয়া যায়। গ্রাফে দেখা যাচ্ছে, মহাবিশ্বের সূচনা ঘটেছে খুব নিবিড় অবস্থা থেকে। তারপর থেকে প্রসারণ ঘটছে খুব দ্রম্নত বেগে। এবং সময়ের সাথে সাথে মহাবিশ্বের আয়তন যত বেড়েছে, পদার্থের ঘনত্বও নিয়মিত ভিত্তিতে ততই কমে গেছে। রেখাটি ধরে পেছন দিকে এগোতে এগোতে সূচনা পর্যন্ত্ম গেলে (চিত্রের ০ অবস্থানে) দেখা যায়, মহাবিশ্বের শুরম্ন হয়েছে শূন্য সাইজ থেকে। আর সে সময় প্রসারণ হার ছিল অসীম। অন্য কথায়, আমরা আজ যেসব ছায়াপথ দেখছি, এগুলো যে পদার্থ দিয়ে তৈরি সেগুলোর সূচনা হয়েছে তীব্র গতির একটিমাত্র বিন্দু থেকে। তথাকথিত বিগ ব্যাং এর এটি একটি আদর্শায়িত বিবরণ।

চিত্র ৩.২

চিত্রে যেমনটা দেখানো হলো, অনেকটা সেভাবেই মহাবিশ্বের প্রসারণ হার সময়ের সাথে সাথে নিয়মিত ভিত্তিতে কমে আসে। সরল এ নমুনায় সময়ের অড়্গের শূন্য বিন্দুতে প্রসারণ হার অসীম। এ বিন্দুটিই বিগ ব্যাং এর সময় নির্দেশ করছে।

কিন্তু রেখাটিকে পেছনটা পর্যন্ত্ম টেনে যাওয়ার চিন্ত্মাটা কতটুকু যৌক্তিক? অনেক কসমোলজস্টি মনে করেন, কাজটা ঠিকই আছে। যেহেতু আমরা আশাই করছি যে মহাবিশ্বের একটি শুরম্ন আছে (আগের অধ্যায়ে আলোচিত কারণগুলোর সাহায্যে) অতএব, নিশ্চিতভাবে মনে হচ্ছে সেটা বিগ ব্যাংই হবে বলে। যদি সেটাই হয়, তাহলে রেখার সূচনা বিন্দুটি যেনতেন কোনো বিস্ফোরণ নয়। মনে রাখতে হবে, এখানের গ্রাফটিতে খোদ স্থানেরই প্রসারণ দেখানো হয়েছে। অতএব, শূন্য আয়তনের অর্থ শুধু এটাই নয় যে পদার্থ অসীম ঘনত্বের স্থানে গুটিয়ে আছে। এর আরও অর্থ হলো, স্থান গুটিয়ে আছে শূন্যতার (nothing) মাঝে। অন্য কথায়, বিগ ব্যাং একই সাথে স্থান এবং পদার্থ ও শক্তির সূচনা। এখানে একটি গুরম্নত্বপূর্ণ কথা বুঝতে হবে। এ ধারণা অনুসারে আগে থেকে এমন কোনো শূন্যস্থান ছিল না, যেখানে বিগ ব্যাং ঘটেছিল।

সময়ের সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। পদার্থের অসীস ঘনত্ব এবং স্থানের অসীম সংকোচন সময়েরও একটি সীমানা বেঁধে দেয়। কারণ, মহাকর্ষ সময় এবং স্থান দুটোকেই লম্বা করে দেয়। এটাও আইনস্টাইনের সার্বিক আপেড়্গিকতা তত্ত্বের একটি ফলাফল। পরীড়্গামূলকভাবে এর সরাসরি প্রমাণও পাওয়া গেছে। বিগ ব্যাং এর পরিবেশ বলছে, স্থানের বিকৃতি ছিল অসীম। ফলে বিগ ব্যাং এর আগের সময় (এবং স্থান) এর ধারণা এখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে আমরা সিদ্ধান্ত্ম নিতে বাধ্য হচ্ছি যে বিগ ব্যািংই হলো সকল ভৌত জিনিস— স্থান, কাল, পদার্থ ও শক্তির চূড়ান্ত্ম সূচনা। এ প্রশ্নের কোনো অবকাশ নেই (যদিও অনেকেই প্রশ্নটি করে থাকেন) যে বিগ ব্যাং এর পূর্বে কী ঘটেছিল? অথবা কেনই বা বিস্ফোরণটি ঘটেছিল? পূর্ব বলতেই কিছু ছিল না। আর যেখানে সময়েরই অসিত্মত্ব নেই সাধারণ অর্থে কার্যকারণ বলতেও কিছু থাকে না।

মহাবিশ্বের সূচনা সম্পর্কে বিগ ব্যাং তত্ত্বের বক্তব্যগুলো অদ্ভূত। তবে বিগ ব্যাং এর প্রমাণের জন্যে যদি মহাবিশ্বের প্রসারণের ওপরই নির্ভর করা হতো, তাহলে সম্ভবত অনেক কসমোলজিস্টই একে মেনে নিতেন না। কিন্তু ১৯৬৫ সালে তত্ত্বটির পড়্গে গুরম্নত্বপূর্ণ আরও প্রমাণ এল। জানা গেল, পুরো মহাবিশ্ব তাপীয় বিকিরণে পরিপূর্ণ। মহাশূন্য থেকে আসা এ বিকিরণ বিগ ব্যাং এর অল্প সময় পরের। আসছে আকাশের সব দিক থেকে একই তীব্রতা নিয়ে। অন্য কিছু দ্বারা এটি বাধাগ্রস্থ হয় না বললেই চলে। ফলে এটি আমাদের সামনে আদিম মহাবিশ্বের অবস্থার একটি চিত্র তুলে ধরছে। এই তাপীয় বিকিরণের বর্ণালির সাথে তাপগতীয় সাম্যাবস্থায় পৌঁছা একটি চুলিস্নর উত্তাপের হুবহু মিল রয়েছে। এ ধরনের বিকিরণকে পদার্থবিজ্ঞানীরা বলেন কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ**\*।** ফলে আমরা বুঝতে পারছি, প্রাথমিক মহাবিশ্ব এমন একটি সাম্যাবস্থায়ই ছিল। সর্বত্র তাপমাত্রা ছিল একই রকম।

এই পটভূমি তাপীয় বিকিরণ পরিমাপ করে জানা গেল, এর তাপমাত্রা হলো পরম শূন্য তাপমাত্রার চেয়ে প্রায় তিনি ডিগ্রি বেশি (পরম শূন্য তাপমাত্রা হলো মাইনাস ২৭৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস)। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে ধীরে ধীরে তাপমাত্রার পরিবর্তন হয়। প্রসারণের সাথে সাথে একটি সরল সূত্র মেনে মহাবিশ্ব ঠা্লা হতে থাকে। ব্যাসার্ধ দ্বিগুণ হলে তাপমাত্রা অর্ধেকে নেমে আসে। এই শীতলীকরণ প্রভাব আর আলোর লোহিত সরণ একই জিনিস। তাপীয় বিকিরণ আর আলো—দুটোই তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ দ্বারা গঠিত। এবং মহাবিশ্বের প্রসারণের সাথে সাথে তাপীয় বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্যও বড় হতে থাকে। উচ্চ তাপমাত্রার চেয়ে নিম্ন তাপমাত্রার বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য (গড়ে) অপেড়্গাকৃত বড় হয়। আবার, উল্টো করে দেখলে আমরা দেখি, অতীতে মহাবিশ্ব অবশ্যই অনেক বেশি উত্তপ্ত ছিল। এই বিকিরণের সূচনা ঘটেছিল বিগ ব্যাং এর তিন লড়্গ বছর পরে। যে সময় শীতল হতে হতে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা নেমে এসেছিল প্রায় ৩০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস-এ। এর সময়ের আগে মূলত হাইড্রোজেন দিয়ে গঠিত আদিম গ্যাস ছিল আয়নিত পস্নাজমা**\* আকারে।** এ কারণে সে সময় এ গ্যাসের ভেতর দিয়ে তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণ সঞ্চালিত হতে পারত না। তাপমাত্রা কমলে পস্নাজমা সাধারণ (অ-আয়নিত) হাইড্রোজেন গ্যাসে পরণিত হলো। বিকিরণ এর মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হতে পারে। ফলে বিকিরণ এবার মুক্তভাবে ছড়িয়ে পড়তে শুরম্ন করল।

পটভূমি বিকিরণ একটু আলাদা। সেটা শুধু এর বর্ণালির কৃষ্ণবস্তুর মতো আচরণের জন্যেই নয়। আকাশের সব দিকে এটি দারম্নণভাবে একই রকম। মহাশূন্যের আলাদা দিকে এই বিকিরণের তাপমাত্রার পার্থক্য মাত্র এক লড়্গ ভাগের এক ভাগ। এটা থেকে বোঝা যায়, বড় মাপকাঠিতে চিন্ত্মা করলে মহাবিশ্ব উলেস্নখযোগ্যভাবে সমধর্মী। কারণ, স্থানের কোনো একটি অঞ্চলে বা নির্দিষ্ট কোনো দিকে যদি পদার্থ নিয়মতান্ত্রিকভাবে পুঞ্জিভূত হতো, তাহলে তাপমাত্রার পার্থক্য দেখা যেত। অন্য দিকে আমরা জানি, মহাবিশ্ব পুরোপুরি সুষম নয়। পদার্থ একীভূত ছায়াপথ তৈরি হয়ে েআছে। বিভিন্ন ছায়াপথ মিলে আবার তৈরি হয় ক্লাস্টার বা সত্মবক। এই ক্লাস্টাররা আবার তৈরি করে সুপারক্লাস্টার। বহু মিলিয়ন আলোকবর্ষের মাপকাঠিতে মহাবিশ্বের আকৃতি অনেকটা ফেনার মতো। বিপুল পরিমাণ শূন্যতার মাঝে মাঝে ছায়াপথ তন্তুর উপস্থিতি।

চিত্র: ৩.২.১

(ছায়াপথ তন্তুর (Galaxy filament) চেহারা বড় মাপকাঠিতে ৩.২.১ চিত্রের মতো। এটি হলো মহাবিশ্বের জানা কাঠামোগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়। দৈর্ঘ্য হতে পারে ১৬ কোটি থেকে ২৬ কোটি আলোকবর্ষ পর্যন্ত্ম। -অনুবাদক)

বড় স্কেলে মহাবিশ্বের এই গুচ্ছবদ্ধতা প্রারম্ভিক মসৃণ অবস্থা থেকেই কোনোভাবে জন্ম নিয়েছে। এর পেছেনে অনেকগুলো ভৌত কারণ থাকতে পারে। তবে সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা হলো ধীর মহাকর্ষীয় আকর্ষণ। বিগ ব্যাং তত্ত্ব সঠিক হয়ে থাকলে গুচ্ছবদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়ার প্রাথমিক অবস্থার কিছু প্রমাণ মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণের মধ্যে থাকার কথা। ১৯৯২ সালে কোব (COBE বা Cosmic Background Explorer) নামে নাসার একটি কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে জানা যায়, বিকিরণ পুরোপুরি মসৃণ নয়। আকাশের এক দিক থেকে আরেক দিকে এতে সুস্পষ্ট ছন্দপতন দেখা যাচ্ছে। অথবা দেখা যাচ্ছে তীব্রতার উঠা-নামা। এই ড়্গুদ্র ড়্গুদ্র ছন্দপতনগুলোই সুপারক্লাস্টারদের গঠন প্রক্রিয়ার নির্বিঘ্ন সূচনা করেছিল। এ বিকিরণ আদিম গুচ্ছবদ্ধতার চিহ্ন আস্থার সাথে ধরে রেখেছে। সেটাও আবার বহু কাল যাবত। এর গ্রাফ বলছে, আজ আমরা যে সৃশৃঙ্খল স্বতন্ত্র মহাবিশ্ব দেখছি, এটি সব সময় এমন ছিল না। শুরম্নতে মহাবিশ্ব ছিল প্রায় পুরোপুরি সুষম অবস্থায়। একটি লম্বা বিবর্তনের মাধ্যমে পদার্থ পুঞ্জীভূত হতে হতে পরবর্তীতে ছায়াপথ ও নড়্গত্রের জন্ম হয়।

উত্তপ্ত ঘন অবস্থা থেকে মহাবিশ্বের জন্ম হওয়ার সপড়্গে আরেকটি চূড়ান্ত্ম প্রমাণও আছে। আজকের দিনের তাপীয় বিকিরণের তাপমাত্রা জেনে আমরা সহজেই হিসাব করে ফেলতে পারি যে জন্মের প্রায় এক বছর পর মহাবিশ্বের সবখানে তাপমাত্রা ছিল প্রায় এক হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই তাপমাত্রা এতটাই বেশি যে এতে যৌগিক পরমাণুর কেন্দ্রের পড়্গেও টিকে থাকা সম্ভব নয়। সেই সময় বস্তু অবশ্যই এর সবচেয়ে মৌলিক উপাদানে বিভক্ত ছিল। ফলে এ সময় প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রনের মতো মৌলিক১ কণিকারা বিচরণ করছিল থরে থরে। কিন্তু তাপমাত্রা একটু কমলে নিউক্লীিয় বিক্রিয়া ঘটা সম্ভব হল। বিশেষ করে প্রোটন ও নিউট্রন মুক্তভাবে জোড়ায় জোড়ায় যুক্ত হবার সুযোগ পেল। শেষ পর্যন্ত্ম এই জোড়াগুলোই যুক্ত হয়ে হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্র (নিউক্লিয়াস) গঠন করে। হিসাব করে দেখা গেছে, এই নিউক্লীয় প্রক্রিয়াগুলো চলছিল প্রায় তিন মিনিট ধরে (এর ওপর ভিত্তি করেই স্টিভেন উইনবার্গের বইয়ের নাম দিয়েছিলেন দ্য ফার্স্ট থ্রি মিনিটস)। এটুকুন সময়ের মধ্যে প্রায় চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ পদার্থ হিলিয়ামে পরিণত হয়। এতে করে উপস্থিত সবগুলো নিউট্রন কণা শেষ হয়ে যায়। ফলে আর কোনো উপায় না দেখে বাকি সব অযুক্ত প্রোটনগুলো হাইড্রোজেন২ নিউকিস্নয়াসে পরিণত হয়। তার মানে তত্ত্ব বলছে, মহাবিশ্বে প্রায় ৭৫ ভাগ হাইড্রোজেন ও ২৫ ভাগ হিলিয়াম থাকা উচিত্। বর্তমান সময়ের হিসাব-নিকাশের সাথে এই বক্তব্যের খুব ভালো মিল পাওয়া গেছে।

আদিম সেই নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় সম্ভবত সামান্য পরিমাণ ডিউটেরিয়াম৩, হিলিয়াম-৩ এবং লিথিয়ামও তৈরি হয়েছিল। তবে ভারী মৌলগুলো বিগ ব্যাং এর সময় তৈরি হয়নি। মহাজাগতিক পদার্থগুলোর মধ্যে এদের পরিমাণ এক শতাংশেরও কম। এগুলো প্রসত্মত হয়েছিল আরও অনেক পরে। নড়্গত্রের অভ্যন্ত্মরে। সেটা কীভাবে হয়েছিল তা আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে দেখব।

সব মিলিয়ে মহাবিশ্বের প্রসারণ, মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণ এবং রাসায়নিক মৌলের আপেড়্গিক প্রাচুর্য- এই বিষয়গুলো বিগ ব্যাং তত্ত্বের সপড়্গে জোরালো প্রমাণ। তবে অনেক প্রশ্নের জবাব এখনও অজানা। যেমন, মহাবিশ্ব ঠিক এই হারেই কেন প্রসারিত হচ্ছে? মানে, বিগ ব্যাং কেন এত বিগ (বড়) ছিল? প্রাথমিক মহাবিশ্ব কেন এতটা সুষম (সব দিকে একই রকম) ছিল? এহাশূন্যের সব দিকে কেনইবা প্রসারণ হার এতটা সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল? কোব (COBE) যে একটু ব্যতিক্রম ঘনত্বের অঞ্চল খুঁজে পেয়েছে তারই বা উত্স কী ছিল? ছায়াপথ ও ছায়াপথ গুচ্ছ তৈরিতে কিন্তু এটুকু ব্যতিক্রমের খুব দরকার ছিল।

এই বড় ধাঁধাগুলো সমাধানের লড়্গ্যে সাম্প্রতিক সময়ে বড় বড় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উচ্চ-শক্তির কণাপদার্থবিদ্যার সাথে বিগ ব্যাং তত্ত্বকে একীভূত করা হচ্ছে। একটা বিষয় আগেই বলে রাখি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই ‘নতুন কসমোলজি’ কিন্তু আগে আলোচিত বিষয়গুলোর চেয়ে একটু কম নির্ভরযোগ্য। বিশেষ করে কণিকার যে পরিমাণ শক্তি প্রত্যড়্গভাবে পযংবেড়্গণ করা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিতে সংঘটিত প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করব আমরা। আর এই প্রক্রিয়াগুলো সংঘটিত হয়েছিল মহাবিশ্বের জন্মের পরের সেকেন্ডের অতি ড়্গুদ্র এক ভগ্নাংাশ সময়ের মধ্যে। সেই সময়ের অবস্থা সম্ভবত এতটাই চরম ছিল যে বর্তমানে গাণিতক নমুনা (model) ছাড়া আমাদের হাতে কিছুই নেই। এই নমুনার ভিত্তি নিছকই তাত্ত্বিক কিছু ধারণা।

এই নতুন কসমোলজির একটি অনুমান হলো ইনফ্লেশন বা স্ফীতি (inflation) নামের একটি প্রক্রিয়া। এটির মূল বক্তব্য হলো, এক সেকেন্ডের প্রথম ভগ্নাংশের কোনো এক সময়ের মধ্যে মহাবিশ্ব হঠাত্ করে বড় হয়ে বিশাল আকার ধারণ করে। বিষয়টি বুঝতে হলে ৩.২ চিত্রটি আবার দেখুন। রেখাটি সব সময় নিচের দিকেই বেঁকে আসে। তার মানে, স্থানের সাইজ বড় হতে থাকলেও তা হয় ক্রমেই ড়্গুদ্রতর হারে। অন্য দিকে, স্ফীতির সময় প্রসারণ ঘটেছিল ক্রমশ দ্রম্নততর বেগে। এ অবস্থাটি দেখানো হয়েছে ৩.৩ নং চিত্রে (সঠিক অনুপাতে নয়)। প্রথমে প্রসারণ থামছিল, কিন্তু স্ফীতি শুরম্ন হতে হতে এটি দ্রুত বেড়ে যায়। কিছু সময়ের জন্যে রেখাটি উপরের দিকে ছুটতে থাকে। শেষে রেখাটি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। কিন্তু এর মধ্যেই স্থানের সাহজ ৩.২ চিত্রের অবস্থানের তুলনায় অনেক অনেক বড় হয়ে যায় (এখানে যা দেখানো হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি)।

চিত্র ৩.৩

স্ফীতির স্বরূপ। একটি বিস্ফোরণের মাধ্যমে শুরম্ন হওয়ার পরে অতি অল্প সময়ের মধ্যে মহাবিশ্ব হঠাত্ করে বিশাল বড় হয়ে যায়। উলম্ব অড়্গটিকে খুব বেশি সঙ্কুচিত করে দেখানো হয়েছে। স্ফীতি দশার পরে প্রসারণের হার ক্রমশ কমতে থাকে। ৩.২ চিত্রের মতোই।

কিন্তু মহাবিশ্বের আচরণ কেন এমন হলো? এখানে মাথায় রাখতে হবে যে রেখার নিচের দিকে গতিটা পেছনে দায়ী হলো মহাকর্ষীয় আকর্ষণ বল। এটি প্রসারণকে থামিয়ে দিতে চায়। ফলে উপরের দিকে গতিকে এক ধরনের অ্যান্টিগ্র্যাভিটি বা বিপরীত মহাকর্ষ তথা বিকর্ষণ বলের প্রভাব ধরে নেওয়া যেতে পারে। যার ফলে মহাবিশ্বের সাইজ ক্রমশ বড় হচ্ছে। বিপরীত মহাকর্ষের ধারণাকে খুব অদ্ভুত মনে হতে পারে। কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু অনুমাননির্ভর তত্ত্বের মতে একেবারে প্রাথমিক মহাবিশ্বের তাপমাত্রা ও ঘনত্বের চরম অবস্থায় এমন কিছু ঘটে থাকতেও পারে।

সেটা কীভাবে তা বলার আগে আমি বলতে চাই কীভাবে স্ফীতি তত্ত্ব ওপরে উলিস্নখিত কিছু মহাজাগতিক ধাঁধার সমাধান করতে পারে। প্রথমত, ক্রমশ দ্রম্নত হারের প্রসারণ থেকে বিগ ব্যাং কেন এত বড় ছিল তার একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অ্যান্টিগ্রঅভিটি প্রভাবটি বেশ অস্থিতিশীল ও তাত্ড়্গণিত প্রক্রিয়া। তার মানে, মহাবিশ্বের সাইজ বড়হ য় সূচকীয় হারে (exponentially)। গাণিতিকভাবে বললে এ কথার মানে দাঁড়ায়, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সময়ে একটি নির্দিষ্ট পরমািণ স্থানের আকার দ্বিগুণ হয়। ধরা যাক, এ সময়টির নাম একটি টিক। তাহলে দুটি টিক পরে সাইজ হবে চারগুণ। তিন টিকের পরে আটগুণ। দশ টিকের পরে স্থানটি প্রসারিত হবে ১০ হাজার গুণেরও বেশি। হিসাব করে দেখা গেছে, স্ফীতি যুগ পরবর্তী প্রসারণ হার বর্তমান সময়ে পর্যবেড়্গণে প্রাপ্ত প্রসারণ হারের সাথে মিলে গেছে। (এটা দ্বারা আসলে কী বোঝাতে চাচ্ছি তা আমি ষষ্ঠ অধ্যায়ে সবিসত্মারে বলব)

স্ফীতির কারণে সাইজ বেড়ে যাওয়া থেকে মহাবিশ্বের সুষম হবার পেছনের কারণটাও সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। স্থানের প্রসারণের কারণে প্রাথমিক যেকোনো বিষমতা উধাও হয়ে যাবে। বেলুনকে ফুলিয়ে বড় করলে যেভাবে এর ভাঁজগুলো উধাও হয়ে যায় সেভাবেই। একইভাবে, প্রাথমিক পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রসারণের যে ভিন্নতা ছিল তাও স্ফীতির প্রভাবে কিছু সময় পরে মিলিয়ে যায়। কারণ, স্ফীতি সব দিকে সমান তেজে কাজ করে। তাহলে কোব যে সামান্য বিষমতা পেল তার ব্যাখ্যা কী? এর কারণ সম্ভবত স্ফীতি একই সময়ে সকল জায়গায় থামেনি (এর কারণও একটু পরে বলছি)। ফলে কিছু অঞ্চল অন্য অঞ্চলের চেয়ে একটু বেশি ফুলে-ফেঁপে গিয়েছিল। ফলে ঘনত্বেও হয়ে গিয়েছিল কিছু তারতম্য।

এবার কিছু সংখ্যা নিয়ে কথা বলি। স্ফীতি তত্ত্বের সবচেয়ে সরল রূপটিতে স্ফীতির (অ্যান্টিগ্যাভিটি) শক্তি খুব বেশি শক্তিশালী। যা মহাবিশ্বকে এক সেকেন্ডের প্রায় ১০ লড়্গ কোটি কোটি কোটি কোটি ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে দ্বিগুণ বড় করে ফেলে। অতি ড়্গুদ্রাতিড়্গুদ্র এই সময়টিকেই আমি একটু আগে এক টিক বলেছিলাম। মাত্র ১০০ টি টিকের পরেই একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসের সাইজের স্থান ফুলে-ফেঁপে গিয়ে এক লাখ আলোকবর্ষ চওড়া অঞ্চল হয়ে যায়। আগে বলে আসা মহাজাগতিব রহস্যের ব্যাখ্যায় এটা পুরোপুরি যথেষ্ট।

অতিপারমাণবিক কণাপদার্থবিদ্যার বিভিন্ন তত্ত্বের সাহায্যে স্ফীতির উদ্রেককারী অনেকগুলো সম্ভাব্য প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সবগুলো প্রক্রিয়াই কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়াম নামে একটি ধারণার ওপর নির্ভরশীল। এটা বুঝতে হলে আগে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে কিছু কথা জেনে আসতে হবে। কোয়ান্টাম তত্ত্বের সূচনা ঘটেছিল আলো, তাপ ইত্যাদি তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণের ধর্ম সম্পর্কে একটি আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। এই বিকিরণ স্থানের ভেতর দিয়ে তরঙ্গ আকারে চললেও এটি আবার এমনভাবেও আচরণ করতে পারে যাতে মনে হয় এটি আসলে কণা দিয়ে গঠিত। আলোর নির্গমন ও শোষণ ঘটে শক্তির ড়্গুদ্র ড়্গুদ্র প্যাকেট বা গুচ্ছ (কোয়ান্টা) আকারে। এই গুচ্ছগুলোর নাম ফোটন। তরঙ্গ ও কণাময় আচরণের এই সমাবেশ পারমাণবিক ও অতিপারমাণবিক জগতের সব বস্তুর ড়্গেত্রেই দেখা যায়। ফলে, ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি যে সত্ত্বাগুলোকে সাধরণভাবে কণা মনে কার হয়, তাদের সবাই-ই, এমনকি পুরো পরমাণুও বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে তরঙ্গের মতো আচরণ করতে পারে।

কোয়ান্টাম তত্ত্বের একটি প্রধান অংশ হলো ওয়ের্নার হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি। এটি অনুসারে কোয়ান্টাম বস্তুদের সবগুলো বৈশিষ্ট্যের জন্যে সুসংজ্ঞায়তি মান থাকবে না। যেমন একটি ইলেকট্রনের একই সাথে একটি নির্দিষ্ট অবস্থান ও নির্দিষ্ট ভরবেগ থাকতে পারে না। একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে এর শক্তির মানও নির্দিষ্ট থাকতে পারে না। এখানে কাজ করে শক্তির মানের অনিশ্চয়তা। আমাদের চিরচেনা বড় জগতে তো শক্তি সব সময় সংরড়্গিত৪ থাকে (এর সৃষ্টি বা বিনাশ নেই)। কিন্তু কোয়ান্টাম জগতে নীতিটিকে স্থগিত করে রাখা যায়। এক মুহূর্ত থেকে অন্য মুহূর্তে স্বতস্ফূর্ত ও অননুমেয়ভাবে শক্তির পরিমাণ বদলে যেতে পারে। যত অল্প সময় বিবেচনা করা হবে, এই দৈব কোয়ান্টাম বিষমতাও তত বেশি হবে। সত্যি বলতে, কণাটি শূন্য থেকেই শক্তি ধার করতে পারে, যদি কি না আবার খুব দ্রম্নতই সেই শক্তি পরিশোধ করে দেওয়া হয়। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার নীতির সূক্ষ্ম গাণিতিক ভাষ্য মতে বড় আকারে ধার করা শক্তি দ্রুত ফিরিয়ে দিতে হয়। আর ছোট ঋণের মেয়াদ হয় বেশি।

শক্তির এই অনিশ্চয়তা থেকে কিছু দারম্নণ ফলাফল বেরিয়ে আসে। এমনও সম্ভাবনা আছে হঠাত্ করে শূন্য থেকে ফোটনের মতো একটি কণা তৈরি হয়ে গেল। মিলিয়ে গেল খানিক পরেই। এই কণাগুলোর অসিত্মত্ত্ব টিকে থাকে ধার করা শক্তির ওপর নির্ভর করে। এবং সেই কারণে এই অসিত্মত্ত্ব নির্ভর করে সময়ের ওপরও। আমরা এদেরকে দেখি না কারণ এরা হয় খুবই ড়্গণস্থায়ী। কিন্তু আমরা যাকে শূন্য স্থান বলে মনে করি সেটা আসলে এ ধরনের ড়্গণস্থায়ী কণায় পরিপূর্ণ। শুধু ফোটনই নয়, এমন কণার মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রন, প্রোটন ও অন্য সবাই। আমাদের পরিচিত ও স্থায়ী কণাগুলো থেকে আলাদা করার জন্যে এই ড়্গণস্থায়ী কণাদেরকে বলা হয় ভার্চুয়াল কণা। স্থায়ীদের নাম যেখানে বাসত্মব কণা।

অস্থায়িত্বের কথা বাদ দিলে ভার্চুয়াল কণার সাথে বাসত্মব কণার কোনো পার্থক্য নেই। এবং বাইরে থেকে শক্তি সরবারহ করে হাইজেনবার্গ ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করলে ভার্চুয়াল কণাদেরকে বাসত্মব কণায়ও রূপান্তুরিত করা সম্ভব। এবং সত্যি বলতে, একে তখন একই ধরনের অন্য বাসত্মব কণা থেকে আলাদা করে চেনাও সম্ভব নয়। যেমন একটি ভার্চুয়াল ইলেকট্রন সাধারণত মাত্র ১০-২১ সেকেন্ড সময় স্থায়ী হয়। স্বল্পায়ুর জীবনে জীবনে এটি কিন্তু স্থির বসে থাকে না। বিনাশ হবার আগে আগে অতিক্রম করে ফেলতে পারে ১০-১১ সেন্টিমিটার পথ (যেখানে একটি পরমাণু ১০-৮ সেন্টিমিটার চওড়া)। এই সময়ের মধ্যেই যদি ভার্চুয়াল ইলেকট্রনটি কোথাও থেকে শক্তি গ্রহণ করতে পারে (যেমন ধরম্নন তড়িচ্চুম্বকীয় ড়্গেত্র থেকে), তাহলে আর একে বিলুপ্ত হতে হবে না। এটি তখন বিলকুণ স্বাভাবিক ইলেকট্রন হিসেবে নিজের অসিত্মত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে।

আমরা এই ভার্চুয়াল কণাদেরকে দেখতে না পেলেও জানি যে শূন্য স্থানে এদের অসিত্মত্ব আছে। কারণ এদের শনাক্তযোগ্য লড়্গণ এরা রেখে যায়। যেমন ভার্চুয়াল ফোটনের একটি প্রভাব হলো, এটি পরমাণুর শক্তি সত্মরে৫ শক্তির সামান্য পরিবর্তন তৈরি করে। এছাড়াও ইলেকট্রনের চৌম্বক ভ্রামকেও সমান পরিমাণ পরিবর্তন ঘটায়। বর্ণালীবীড়্গণ পদ্ধতিতে ইতোমধ্যেই এই ছোট কিন্তু গুরম্নত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলো নিখুঁতভাবে পরিমাপ করা হয়েছে।

কিন্তু আরেকটি বিষয় এড়িয়ে গেল ভুল হয়ে যাবে। কারণ হলো অতিপারমাণবিক কণিকারা কিন্তু মুক্তভাবে চলাচল করে না। এটা নির্ভর করে অনেকগুলো বলের ওপর। কোন প্রকার বল কাজ করবে সেটা নির্ভর করবে কণার প্রকৃতির ওপর। এ বলের প্রভাবে কিন্তু ওপরে দেওয়া কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়ামের সরল চিত্রটি একদম পাল্টে যায়। এই বল কণাদের স্ব স্ব ভার্চুয়াল কণাদের মধ্যেও কাজ করে। অতএব হতে পারে যে একের বেশি ধরনের ভ্যাকুয়াম অবস্থার অসিত্মত্ব রয়েছে। একাধিক সম্ভাব্য কোয়ান্টাম অবস্থার (স্টেট) অসিত্মত্ব কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার একটি পরিচিত দিক। এর সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ হলো পরমাণুর বিভিন্ন শক্তি সত্মর। পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে প্রদড়্গিণরত ইলেকট্রন শুধু নির্দিষ্ট শক্তির কিছু সুসংজ্ঞায়িত অবস্থাতেই অসিত্মত্ববান থাকতে পারে। সবচেয়ে নিচের সত্মরের নাম গ্রাউন্ড স্টেট। এটা স্থিতিশীল অবস্থা। উচ্চতর অবস্থাগুলো উত্তেজিত ও অস্থিতিশীল। কোনো ইলেকট্রন উচ্চতর অবস্থায় চলে গেলে এটি এক বা একাধিক ধাপে পুনরায় নিচের সত্মরে অবস্থিত গ্রাউন্ড স্টেটে চলে আসবে। সুসংজ্ঞায়িত অর্ধায়ু (half life) বিশিষ্ট উত্তেজিত অবস্থা এভাবেই ড়্গয় হতে থাকে।

ভ্যাকুয়ামের ড়্গেত্রেও একই নীতি কাজ করে। এতে এক বা একাধিক উত্তেজিক স্টেট থাকতে পারে। এই স্টেটগুলোর শক্তির পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন। অবশ্য তাদেরকে দেখতে একই রকম দেখাবে। আর যাই হোক, সবই তো খালি! সর্বনিম্ন শক্তি সত্মর বা গ্রাউন্ড স্টেটকে অনেক সময় বলা হয় প্রকৃত ভ্যাকুয়াম। কারণ, এটাই হলো স্থিতিশীল অবস্থা। এবং এটিই আমাদের বর্তমানের দেখা মহাবিশ্বের শূন্য স্থান হিসেবে কাজ করে। উত্তেজিত ভ্যাকুয়ামকে বলা হয় নকল ভ্যাকুয়াম।

তবে বলে রাখা ভাল, নকল ভ্যাকুয়াম এখন পর্যন্ত্ম নিছকই তাত্ত্বিক একটি ধারণা। এবং এদের বৈশিষ্ট্যও মূলত নির্ভর করে কোন তত্ত্ব দিয়ে এদেরকে বিচার করা হচ্ছে তার ওপর। তবে সাম্প্রতিক তত্ত্বগুলোতে এদের ধারণা সহজাতভাবেই চলে আসে। এ তত্ত্বগুলোর লড়্গ্য হলো প্রকৃতির চারটি মৌলিক বলকে একীভূত করা। বলগুলো হলো মহাকর্ষ, আমাদের পরিচিত তড়িচ্চুম্বকীয় বল এবং স্বল্প-পালস্নার দুটি নিউক্লীয় বল, যারা দুর্বল ও সবল বল হিসেবে পরিচতি। এক সময় অবশ্য তালিকাটা আরও লম্বা ছিল। তড়িত্ ও চৌম্বক বলকে এক সময় আলাদা ভাবা হত। একীভূত করার কাজ শুরম্ন হয় ঊনিশ শতকের শুরম্নর দিকে। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে এ কাজে ভালো অগ্রগতি হয়েছে। এখন জানা হয়ে গেছে যে তড়িচ্চুম্বকীয় এবং দুর্বল নিউক্লীয় বল একই সুতোয় গাঁথা। একে এক কথায় বলা হচ্ছে তড়িত্দুর্বল বল (electroweak force)। বহু পদার্থবিদ বিশ্বাস করেন, সবল বলও তড়িত্দুর্বল বলের সাথে মিলে যাবে। এমন মিল তৈরিতে সড়্গম তত্ত্বগুলোকে বলা হয় গ্র্যান্ড ইউনিফায়েড থিওরি। এটা হওয়া খুব সম্ভব যে গভীর কোনো পর্যায়ে সবগুলো ফোর্স বা বল একটিমাত্র সুপার-ফোর্সে এসে মিলিত হবে।

স্ফীতি প্রক্রিয়ার সবচেয়ে ভালো ব্যখ্যাগুলো পাওয়া যায় বিভিন্ন গ্র্যান্ড ইউনিফায়েড থিওরি থেকেই। এ তত্ত্বগুলোর একটি মূল বৈশিষ্ট্য হলো নকল ভ্যাকুয়াম স্টেটের শক্তি অনেক বেশি। মাত্র এক ঘনমিটার স্থানের শক্তি ১০৮৭ জুল৬। এমন অবস্থায় পরমাণুর মতো ছোট্ট আয়তনের জায়গায়ও ১০৬২ জুল শক্তি থাকবে। যেখানে একটি উত্তেজিত পরমাণুর শক্তি মাত্র ১০-১৮ জুল। ফলে প্রকৃত ভ্যাকুয়ামকে উত্তেজিত অনেক অনেক বেশি শক্তি প্রয়োজন। এবং বর্তমান মহাবিশ্বে নকল ভ্যাকুয়ামের দেখা পাওয়ার আশাও নেই। তবে বিগ ব্যাং এর মতো চরম অবস্থায় বিষয়গুলো সম্ভব।

নকল ভ্যাকুয়াম স্টেটে যে বিপুল পরিমাণ শক্তি থাকে তার থাকে তীব্র মহাকর্ষীয় প্রভাবও। কারণ, আইনস্টাইন আমাদের দেখিয়েছেন, শক্তিরও ভর আছে। ফলে সাধারণ বস্তুর মতো এরও মহাকর্ষীয় আকর্ষণ থাকবে। কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়ামের তীব্র শক্তি খুব তীব্র আকর্ষণধর্মী। এক ঘনমিটার নকল ভ্যাকুয়ামের শক্তি ১০৬৭ টন ভরের সমান। পর্যবেড়্গণযোগ্য পুরো মহাবিশ্বের ভরও আরও কম (১০৫০)। এই তীব্র মহাকর্ষ স্ফীতির পড়্গে কথা বলে না। স্ফীতির জন্যে দরকার কোনো রকম একটি অ্যান্টিগ্র্যাভিটি। কিন্তু নকল ভ্যাকুয়ামের বিশাল শক্তির জন্যে দরকার একই রকম বিশাল পরিমাণ নকল ভ্যাকুয়াম চাপ (false-vacuum pressure)। এই চাপটাই কিন্তু আসল বিষয়। আমরা সাধারণত চাপকে মহাকর্ষের উত্স মনে করি না। কিন্তু আসলে সেটি উত্স হিসেবে কাজ করে। বাইরের দিকে যান্ত্রিণ বল প্রয়োগ করলেও চাপ আবার ভেতরের দিকেও মহাকর্ষীয় টান তৈরি করে। আমাদের সদা-পরিচিত বস্তুদের ড়্গেত্রে তার ভরের তুলনায় চাপের মহাকর্ষীয় প্রভাব খুব নগণ্য। যেমন, পৃথিবীতে আপনার ওজনের একশ কোটি ভাগের এক ভাগেরও কমের পেছনে দায়ী হলো পৃথিবীর অভ্যন্ত্মরীণ চাপ। কিন্তু তবুও এটা কিন্তু বাসত্মব। এবং কোনো সিস্টেমে চাপ অত্যধিক হলে ভরজনিত মহাকর্ষীয় প্রভাবের চেয়েও এটি বেশি করে অনুভূত হবে।

নকল ভ্যাকুয়ামের ড়্গেত্রে শক্তি৭ যেমন বিশাল, তেমনি বিশাল তার চাপ। কিন্তু, গুরম্নত্বপূর্ণ বিষয় হলো চাপ এখানে ঋণাত্মক। ফলে নকল ভ্যাকুয়াম ধাক্কা দেয় না, বরং টানে। ঋণাত্মক চাপ তৈরি করে ঋণাত্মক মহাকর্ষীয় টান। মানে অ্যান্টিগ্র্যাভিটি। ফলে নকল ভ্যাকুয়ামের মহাকর্ষ নিয়ে শক্তির আকর্ষণধর্মী ও চাপের বিকর্ষণধর্মী প্রভাবের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলে। জিত হয় চাপেরই। এবং বিকর্ষণের নেট প্রভাব এত বেশি যে এটি মুহূর্তের মধ্যে মহাবিশ্বকে উড়িয়ে দিতে পারে। স্ফীতির এমন তীব্র ধাক্কার ফলেই মহাবিশ্ব প্রতি ১০-৩৪ সেকেন্ডের মতো ড়্গুদ্র সময়ে প্রচ্ল গতিতে দ্বিগুণ বড় হত।

নকল ভ্যাকুয়াম সহজাতভাবে অস্থিতিশীল। সকল উত্তেজিত কোয়ান্টাম স্টেটের মতো এটিও ড়্গয় হয়ে গ্রাউন্ড স্টেটে, মানে প্রকৃত ভ্যাকুয়ামে আসতে চায়। সম্ভবত কয়েক ডজন ‘টিক’ পার হলে এটি এটা করতে সড়্গম হয়। কোয়ান্টাম প্রক্রিয়া হবার কারণে এর মধ্যে অনিবার্যভাবে কাজ করে অনিশ্চয়তা ও দৈব পরিবর্তন, যেটা একটু হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতির কথা বলতে গিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তার মানে, স্থানের সব দিকে ড়্গয় একই হারে ঘটবে না। বিভিন্ন দিকে তা হবে আলাদাভাবে। কিছু কিছু তাত্ত্বিকের মতে কোব (COBE) যে ব্যতিক্রম খুঁজে পেয়েছে তার কারণ এই ভিন্নতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

নকল ভ্যাকুয়াম ড়্গয় হয়ে গেলে মহাবিশ্ব তার স্বাভাবিক প্রসারণ শুরম্ন করল। মানে ধীরে ধীরে কমল প্রসারণের হার। নকল ভ্যাকুয়অমে আবদ্ধ শক্তি অবমুক্ত হলো। এটা বের হলো তাপ আকারে। স্ফীতির কারণে যে বিশাল প্রসারণ ঘটল, তাতে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা পরম শূন্যের খুব কাছাকাছি হলো। হঠাত্ স্ফীতি থেমে যাওয়ায় তাপমাত্রা আবার বেড়ে ১০২৮ ডিগ্রি হয়ে গেল। এই বিপুল তাপ আজও রয়ে গেছে। অবশ্য সেটার তীব্রতা অনেক কমে গেছে। এরই নাম মহাজাগতিক পটভূমি তাপ বিকিরণ। ভ্যাকুয়াম এনার্জি অবমুক্ত হবার পাশাপাশি আরেকটি ঘটনাও ঘটল। কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়ামের অনেকগুলো কণা এ থেকে কিছু শক্তি গ্রহণ করে বাসত্মব কণায় উন্নীত হলো। আরও কিছু প্রক্রিয়া ও পরিবর্তন শেষে এই আদিম কণাগুলোর ধ্বংসাবশেষ থেকে ১০৫০ টন পদার্থ তৈরি হলো। এই পদার্থ থেকেই আপনি, আমি, ছায়াপথ ও মহাবিশ্বের বাকিটা সৃষ্টি হলো।

বড় বড় অনেক কসমোলজিস্টই মনে করেন স্ফীতির ধারণাই মহাবিশ্বের ইতিহাসের সত্যিকার চিত্র প্রদান করে। যদি এটি আসলেই সঠিক হয়, তাহলে মহাবিশ্বের মৌলিক কাঠামো এবং ভৌত উপাদানসমূহ কেমন হবে তা ঠিক হয়ে গিয়েছিল জন্মের মাত্র ১০-৩২ সেকেন্ড পরেই। স্ফীতির পরে মহাবিশ্বের অতিপারমাণবিক সত্মরে ঘটেছিল আরও নানান পরিবর্তন। প্রাথমিক পদার্থ থেকে তৈরি হলো কণা ও পরমাণু। আমাদের সময়ের মহাজাগতিক বস্তুগুলো এদের দিয়েই গড়া। তবে পদার্থের অধিকাংশ বাড়তি প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন হয়েছিল মাত্র প্রায় তিন মিনিটের মধ্যে।

প্রথম তিন মিনিটের সাথে শেষ তিন মিনিটের সম্পর্ক কী? একটি বুলেটের ভাগ্য যেমন এর লড়্গ্যমাত্রার ওপর খুব বেশি নির্ভর করে, তেমনি মহাবিশ্বের পরিণতিও এর প্রাথমিক অবস্থার ওপর দারম্নণভাবে নির্ভরশীল। আমরা সামনে দেখব, প্রাথমিক সূচনা থেকে মহাবিশ্বের প্রসারণ ও বিগ ব্যাং থেকে উদ্ভূত পদার্থের প্রকৃতি মহাবিশ্বের চূড়ান্ত্ম ভবিষ্যতকে কীভাবে প্রভাবিত করে। মহাবিশ্বের শুরম্ন ও শেষ একই সুতোয় গেঁথে আছে শক্তভাবে।

অনুবাদকের নোট:

1. প্রোটন ও নিউট্রন অবশ্য ঠিক মৌলিক কণিকা নয়, গঠিত কোয়ার্ক দিয়ে।
2. হাই্রেডাজেনের সবচেয়ে সরল রূপটিতে একটিমাত্র প্রোটন থাকে। কোনো নিউট্রন থাকে না।
3. ২ টি প্রোটন সম্বলিত হাইড্রোজনের আরেকটি রূপ।
4. শক্তির সংরড়্গণশীলতা নীতি অনুসারে, মহাবিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট। শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নেই। একে কেবল এক রূপ থেকে অন্য এক বা একাধিক রূপে রূপান্ত্মরিত করা যেতে পারে।
5. মানে পরমাণুর কড়্গপথে। সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবলে পরমাণুর কেন্দ্রীয় অবস্থানের নিউক্লিয়াসের চারদিকের বিভিন্ন কড়্গপথে ইলেকট্রনগুলো বন্টিত থাকে।
6. একটি আপেলকে এক মিটার উচ্চতায় তুললে মোটামুটি এক জুল পরিমাণ শক্তি খরচ হয়। এবার চিন্ত্মা করম্নন তাহলে ১০৮৭ জুল কত বিশাল।
7. এনে রাখতে হবে, শক্তি কিন্তু ভরেরই আরেক রূপ। তাই শক্তিরও মহাকর্ষীয় টান থাকবে।

চতুর্থ অধ্যায়

১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২৩ কি ২৪ তারিখ রাতের কথা। কানাডিয়ান জ্যোতির্বিদ ইয়ান শেলটন কাজ করছিলেন লাস ক্যাম্পানাস পর্যবেড়্গণকেন্দ্রে। জায়গাটা চিলীয় আন্দিজের চূড়ায়। একজন নৈশ সহকারি কিছু সময়ের জন্যে বাইরে এলেন। অলস চোখে তাকালেন আকাশেল দিকে। রাতের আকাশ তার নখদর্পণে। ফলে অস্বাভাবিক দৃশ্যটা চোখে পড়তে সময় লাগল না। লার্জ ম্যাজেলানিক ক্লাউড নামের গ্যালাক্সির নীহারিকার দাগের প্রান্ত্মে একটি নতুন নড়্গত্র। উজ্জ্বলতা অত বেশি নয়। কালপুরম্নষের কোমরবন্ধের (Orion belt) তারকাগুলোর কাছাকাছি উজ্জ্বল। সবচেয়ে বড় কথা হলো, আগের দিন নড়্গত্রটা ওখানটায় ছিল না।

সহকারি সাহেব ব্যাপারটা শেলটনকে বললেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে খবরটা রাষ্ট্র হয়ে গেল। শেলটন আর তার চিলীয় সহকারি একটি সুপারনোভা আবিষ্কার করে ফেলেছেন। ১৬০৪ সালে জোহানেস কেপলারও খালি চোখে একটি সুপারনোভা দেখেছিলেন। তারপরে খালি চোখে এই প্রথম আবার কোনো সুপারনোভা ধরা পড়ল। এর পরপরই বেশ কয়েকটি দেশের জ্যোতির্বিদরা লার্জ ম্যাজেলানিক ক্লাউডের পেছনে যন্ত্রপাতি কাজে লাগাতে শুরম্ন করলেন। পরের মাসগুলোতে ১৯৮৭এ নামের সুপারনোভাটির খুঁটিনাটি খুব সূড়্গ্মভাবে বিশেস্নষণ করা হল।

শেলটনের চাঞ্চল্যকর আবিষ্কারের কয়েক ঘণ্টা আগে ভিন্ন একটি জায়গায় আরেকটি অস্বাভাবিক ঘটনা লিপিবদ্ধ হচ্ছিল। এ জায়গাটা জাপানে। ভূমির অনেকটা গভীরে কামিওকা দসত্মা খনি। এক বুক স্বপ্ন নিয়ে কিছু পদার্থবিদ এখানে এক দীর্ঘমেয়াদী পরীড়্গা চালাচ্ছিলেন। তাঁদের লড়্গ্য ছিল বস্তুর অন্যতম মৌলিক উপাদান প্রোটন কণিকার চূড়ান্ত্ম স্থিতিশীলতা পরীড়্গা করা। ১৯৭০ এর দশকে রচিত গ্র্যান্ড ইউনিফায়েড থিওরি অনুসারে প্রোটন খুব অস্থিতিশীল হতে পারে, যা এক ধরনের তেজস্ক্রিয়তার ফলে সময় সময় ড়্গয় হয়ে থাকতে পারে। এটা সত্যি হলে মহাবিশ্বের ভবিষ্যত নির্ধারণে এর গুরম্নত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। এটা আমরা পরের অধ্যায়ে দেখব।

প্রোটনের ড়্গয় পরীড়্গার জন্যে জাপানের পরীড়্গকরা একটি ট্যাংককে ২০০০ টন অতিবিশুদ্ধ পানি দিয়ে পূর্ণ করলেন। এর চারপাশে রাখলেন উচ্চ-সংবেদনশীল ফোটন ডিটেকটর। ডিটেকটরের কাজ ছিল আলোর ঝলক খুঁজে বের করা। এখানে এমন আলো শুধু উচ্চ গতির প্রোটন ড়্গয়ের মাধ্যমেই আসতে পারে। পরীড়্গার জন্যে ভূমির গভীরের স্থান বেছে নেওয়া হয়েছিল মহাজাগতিক বিকিরণের প্রভাব কমানোর জন্যে। অন্যথায় অপ্রত্যাশিত সঙ্কেতে পেতে পেতে অকার্যকর হয়ে ওঠত ডিটেক্টর।

ফেব্রম্নয়ারির ২২ তারিখ। হঠাত্ করে কামিওকা ডিটেক্টরগুলো এগারো সেকেন্ডের ব্যবধানে অন্ত্মত সমান সংখ্যক সঙ্কেত দিল। এদিকে পৃথিবীর অন্য প্রান্ত্মে ওহাইয়োর সল্ট মাইনে একই রকম একটি ডিটেক্টরে ধরা পড়ল আটটি সঙ্কেত। এক সাথে এতগুলো ড়্গয় হয়ে যাবে এটা একেবারেই অবিশ্বাস্য। অবশ্যই অন্য কোনো ব্যাখ্যা থাকবে এর। পদার্থবিদরা শীঘ্রই সে ব্যাখ্যাটা পেয়েও গেলেন। তাঁদের ডিটেক্টরে ধরা পড়া প্রোটন ড়্গয়ের কারণ অন্য একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। সেটা হলো নিউট্রিনোর আঘাত।

নিউট্রিনোরা এক ধরনের অতিপারমাণবিক কণা। সামনেও এদের কথা আরও আসবে। তাই এখনই খানিকটা বিসত্মারিত জেনে নেওয়া দরকার। ১৯৩১ সালে উলফগ্যাং পাউলি প্রথম এদের অসিত্মত্বের ধারণা দেন। এ তাত্ত্বিক পদার্থবিদের জন্ম অস্ট্রিয়ায়। তেজস্ক্রিয় প্রক্রিয়ার বেটা ড়্গয় নামক অস্পষ্ট দিকটি ব্যাখ্যার জন্যে এ ধারণা দেন তিনি। একটি সাধারণ বেটা ড়্গয় প্রক্রিয়ায় একটি নিউট্রন ভেঙে গিয়ে একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন উত্পন্ন হয়। ইলেকট্রন অপেড়্গাকৃত হালকা কণা হলেও উলেস্নখযোগ্য পরিমাণ শক্তি সাথে নিয়ে বের হয়ে যায়। কিন্তু সমস্যা হলো প্রতিটি ড়্গয় প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রন ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ শক্তি নিয়ে বের হয়। নিউট্রনের ড়্গয় থেকেও প্রাপ্ত মোট শক্তি থেকেও কিছুটা কম। যেহেতু সব ড়্গেত্রেই মোট শক্তির পরিমাণ ধ্রম্নব, মনে হচ্ছে চূড়ান্ত্ম শক্তি প্রাথমিক শক্তি থেকে আলাদা। এটা হবার কথা নয়। কারণ, শক্তি সংরড়্গিত থাকবে- এটা পদার্থবিদ্যার একটি মৌলিক নীতি। তাই পাউলি প্রসত্মাব করলেন, ঐ হারানো শক্তিটুকু অন্য কোনো অদৃশ্য কণা নিয়ে চলে যাচ্ছে। কণাটিকে শনাক্তের প্রাথমিক চেষ্টা অসফল। এটা জানা হয়ে গেলে যে এই কণাদের অসিত্মত্ব থাকলেও ভেদনড়্গমতা হবে অত্যাধিক। আমরা জানি, বৈদ্যুতিকভাবে চার্জযুক্ত যেকোনো কণা বস্তু দ্বারা আবদ্ধ হবে। ফলে পাউলির প্রসত্মাবিত কণাটিকে তড়িত্ প্রশম হতে হবে। কোনো চার্জ থাকবে না) এজন্যেই এর নাম দেওয়া হলো নিউট্রিনো। (নিউট্রাল (neutral) মানে প্রশম-অনুবাদক)

সে সময় কেউ নিউট্রিনোর দেখা না পেলেও তাত্ত্বিকরা এর আরও অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য জেনে গেলন। একটি বৈশিষ্ট্য হলো নিউট্রিনোর ভর নিয়ে।

দ্রম্নতগামী কণিকাদের ড়্গেত্রে ভর নিয়ে একটু সাবধানে কথা বলতে হয়। কারণ, বস্তুর ভর নির্দিষ্ট নয়। নির্ভর করে বেগের ওপর। ডেমন এক কেজি ওজনের একটি সিসার বলের কথা ভাবা যাক। এটি যদি সেকেন্ডে ২ লড়্গ ৬০ হাজার কি.মি. বেগে চলে তবে এর ভর হয়ে যাবে ২ কেজি। এখানে নাটের গুরম্ন আসলে আলোর বেগ। কোনো বস্তুর বেগ আলোর বেগের যত কাছে যাবে, এর ভর তত বেশি হবে। ভরের এই বৃদ্ধির শেষ নেই কোনো। ভর এভাবে বদলে যাচ্ছে বলে বিভ্রান্ত্মি এড়ানোর লড়্গ্যে অতিপারমাণবিক কণাদের ভর বলার সময় পদার্থবিদরা নিশ্চল ভরের কথা বলেন। কণাটি আলোর কাছাকাছি বেগে ভ্রমণ করলে এর প্রকৃত ভর নিশ্চল ভরের বহুগুণ হয়ে যেতে পারে। কণা ত্বরকযন্ত্রের ভেতর প্রদড়্গিণরত ইলেকট্রন ও প্রোটনদের ভর তাদের নিজ নিজ নিশ্চল ভরের বহুগুণও হতে পারে।

নিউট্রিনোর নিশ্চল ভর জানার উপায় একটি আছে বটে। অনেক ড়্গেত্রে বেটা ড়্গয় প্রক্রিয়ার সময় ইলেকট্রন নির্গত হতেই পুরো শক্তি ব্যয় হয়ে যায়। নিউট্রিনোর জন্যে কিছুই বাকি থাকে না। তার মানে অনিবার্যভাবেই নিউট্রিনোকে টিকে থাকতে হয় কোনো শক্তি ছাড়াই। এখন, আইনস্টাইনের বিখ্যাত E = mc2 সূত্র অনুসারে ভর এবং শক্তি সমতুল্য। তার মানে, শক্তি নেই মানে ভরও নেই। তার অর্থ দাঁড়ায়, সম্ভবত নিউট্রিনোর নিশ্চল ভর খুব অল্প। হতে পারে শূন্যও। নিশ্চল ভর সত্যিই শূন্য হলে নিউট্রিনো চলবে আলোর গতিতে। আর তা না হলেও এর বেগ আলোর বেগের খুব কাছাকাছিই হবে।

অতিপারমাণবিক কণিকাদের ঘূর্ণনের সাথে আরেকটি বিষয়ও জড়িত আছে। নিউট্রন, প্রোটন ও ইলেকট্রন সবাইকে সব সময় ঘুরতে দেখা যায়। ঘূর্ণনের মাত্রা নির্দিষ্ট। এবং তিনটির ড়্গেত্রেই মাত্রাটা সমপরিমাণ। ঘূর্ণণ হলো এক ধরনের কৌণিক ভরবেগ। কৌণিখ ভরবেগের সংরড়্গণশীলতা নামে একটি সূত্র আছে। শক্তির সংরড়্গণশীলতা নীতির মতোই এটিও একটি মৌলিক সূত্র। একটি নিউট্রন ড়্গয় হলে ড়্গয় হওয়া অংশেও এর ঘূর্ণন অবিকৃত থাকবে। ইলেকট্রন আর প্রোটন যদি একই দিকে ঘোরে, তবে তাদের ঘূর্ণনের যোগফল হবে নিউট্রনের ঘূর্ণনের দ্বিগুণ। তবে তারা যদি ভিন্ন দিকে ঘোরে, সেড়্গেত্রে যোগফল হবে শূন্য। ঘটনা যাই হোক, একটি প্রোটন বা একটি ইলেকট্রন একা নিউট্রনের সমান হতে পারে না। কিন্তু নিউট্রিনোর কথা হিসাবে ধরলে ভারসাম্য হয়। শুধু ধরে নিতে হবে নিউট্রিনোর ঘূর্ণনের মাত্রাও অন্যদের মতো। সেড়্গেত্রে ড়্গয়কৃত তিনটি অংশের দুটো ঘুরবে একই দিকে, আর তৃতীয়টি উল্টোদিকে।

ফলে নিউট্রিনো শনাক্ত হবার আগেই পদার্থবিদরা বুঝে ফেললেন, এই কণার বৈদ্যুতিক চার্জ থাকবে না। ঘুরবে ইলেকট্রনের মতো একই দিকে। ভর থাকবে না বা থাকলেও সেটা হবে স্বল্প পরিমাণ। সাধারণ বস্তুর সাথে মিথস্ক্রিয়া করবে এতই দুর্বলভাবে যে তার কোনো লড়্গণই চোখে পড়বে না। এক কথায়, এটি এক ধরনের ঘুরন্ত্ম ভূত। ফলে এটা খুবই স্বাভাবিক যে পাউলির অনুমানের পরে পরীড়্গাগারে এর অসিত্মত্ব নিশ্চিত করে প্রমাণ করতে প্রায় বিশ বছর লেগে গেছে। বর্তমানে নিউক্লীয় চুলিস্নতে এরা সংখ্যায় সংখ্যায় তৈরি হয়। ফলে লুকানো স্বভাবের হলেও মাঝেমাঝেই এদেরকে শনাক্ত করে ফেলা যায়।

একই সাথে কামিওকা খনিতে নিউট্রিনোর হানা এবং ১৯৮৭এ সুপারনোভার আবির্ভাব কোন মতেই কাকতালীয় ঘটনা ছিল না। বিজ্ঞানীদের মতে দুটো ঘটনা একই সাথে ঘটার মধ্যে সুপারনোভা তত্ত্বের প্রমাণ রয়েছে। এত দিন ধরে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তো সুপারনোভা থেকেই এক ঝাঁক নিউট্রিনো আসার প্রত্যাশা করছিলেন।

লাতিন ভাষায় নোভা মানে নতুন। তবে ১৯৮৭এ নামের সুপারনোভাটি নতুন কোনো নড়্গত্রের জন্ম ছিল না। এটি আসলে ছিল বৃহত্ বিস্ফোরণের মাধ্যমে পুরাতন এক নড়্গত্রের মৃত্যু। সুপারণোভাটির উত্স লার্জ ম্যাজেলানিক ক্লাউড একটি ড়্গুদ্র ছায়াপথ। দূরত্ব ১ লড়্গ ৭০ হাজার আলোকবর্ষ। এটি আমাদের মিল্কিওয়ে ছায়াপথের এতটাই কাছে যে এটি অনেকটা মিল্কিওয়ের উপছায়াপথ (satellite gallaxy)। দড়্গিণ গোলার্ধ থেকে একে খালি চোখেও দেখা যায়। ছোপ ছোপ আলোর একটি দাগ। নড়্গত্রগুলোকে আলাদা করে দেখতে হলে চাই বড় টেলিস্কোপ। শেল্টনের আবিষ্কারের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অস্ট্রেলীয় জ্যোতির্বিদরা জেনে ফেললেন, লার্জ ম্যাজেলানিক ক্লাউডের কয়েক শ কোটি নড়্গত্রের মধ্যে কোনটি এ বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এটা করার জন্যে তাঁরা আকাশের ঐ অংশের আগের কিছু ফটোগ্রাফিক পেস্নট ব্যবহার করেন। নড়্গত্রটি ছিল বি৩ সুপারজায়ান্ট শ্রেণির১। এটি সূর্যের তুলনায় চওড়া ছিল ৪০ গুণ। নামও আছে একটি। স্যান্ডুলিক-৬৯ ২০২ (Sanduleak -69 202)।

নড়্গত্রের বিস্ফোরণ ঘটতে পারে, এই বিষয় নিয়ে প্রথম গবেষণা চালান জ্যোর্তিপদার্থবিদ ফ্রেড হয়েল, উইলিয়াম ফুলার এবং জেফ্রি ও মারগারেট বারবিজ। এটা ১৯৫০ এর দশকের মাঝামাঝির কথা। এমন উত্তাল দশায় নড়্গত্ররা কী করে আসে তা জানতে হলে বুঝতে হবে এদের ভেতরে চলা প্রক্রিয়াগুলো। আমাদের সবচেয়ে চেনাজানা নড়্গত্র হলো সূর্য। অন্য নড়্গত্রের মতোই দেখে মনে হচ্ছে সূর্যে কোনো পরিবর্তন নেই। আসলে কিন্তু সূর্য প্রতিনিয়ত মৃত্যুর সাথে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। সব নড়্গত্রই গ্যাস দিয়ে তৈরি। এই গ্যাস যুক্ত থাকে মহাকর্ষের কারণে। তবে যুদ্ধড়্গেত্রে মহাকর্ষ একা থাকলে নড়্গত্রটি নিজের তীব্র আকর্ষণে নিমেষের মধ্যে গুটিয়ে যেত। উধাও হয়ে যেত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। কিন্তু সেটা হয় না। কারণ ভেতরের দিকের এই বলের বিপরীতে বাইরের দিকে কাজ করে আরেকটি বল। নড়্গত্রের অভ্যন্ত্মরের সঙ্কুচিত গ্যাসের বহির্মুখী চাপ। দুটোতে তৈরি হয় ভারসাম্য।

গ্যাসের চাপ ও তাপমাত্রার মধ্যে একটি সরল সম্পর্ক আছে। সাধারণত একটি নির্দিষ্ট আয়তনের গ্যাসকে উত্তপ্ত করলে তাপমাত্রার অনুপাতে এর চাপ বাড়ে। আবার তাপমাত্রা কমলে কমে যায় চাপও। নড়্গত্রের ভেতরে তীব্র চাপের কারণ এর তীব্র তাপমাত্রা। বহু মিলিয়ন ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই তাপের উত্স হলো নিউক্লীয় বিক্রিয়া। নড়্গত্রের জীবনের বেশিরভাগ সময় জুড়ে একটি বিক্রিয়াই চলে। সেটা হলো ফিউশন (সংযোজন) বিক্রিয়ার মাধ্যমে হাইড্রোজেনকে হিলিয়ামে রূপান্ত্মর। পরমাণুগুলোর নিউক্লিয়াসের ইলেকট্রনরা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। ফলে এই বিকর্ষণকে পরাভূত করতে বিক্রিয়ার তাপমাত্রা হতে হয় প্রচ্ল। ফিউশনের শক্তি একটি নড়্গত্রকে কয়েক শ কোটি বছর টিকিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু এক দিন না এক দিন জ্তালানি ঠিকই ফুরিয়ে আসে। দুর্বল হয়ে পড়ে বিক্রিয়ার গতি। এবার বহির্মুখী চাপ দুর্বল হয়ে পড়ে। জিতে যায় মহাকর্ষ। নড়্গত্রটি তার অবশিষ্ট জ্তালানি দিয়ে মহাকর্ষজনিত অন্ত্ম:স্ফোটন (ভেতরের দিকে গুটিয়ে যাওয়া) প্রতিহত করে আরেকটু সময় বেঁচে থাকে। কিন্তু পৃষ্ঠ থেকে প্রতিবার মহাশূন্যে শক্তি নিড়্গিপ্ত হবার সাথে সাথে অন্ত্মিম সময় দ্রম্নত ঘনিয়ে আসতে থাকে।

হিসাব করে দেখা গেছে, যে পরিমাণ হাইড্রোজেন নিয়ে সূর্যের পথ চলা শুরম্ন হয়েছে তাতে তার প্রায় এক হাজার কোটি বছর জ্তলার কথা। এখন বয়স পাঁচ শ কোটি বছর। মানে প্রায় অর্ধেক জ্তালানি শেষ। (এখনও ভয়ের কিছু নেই) একটি নড়্গত্র কী হারে নিউক্লীয় জ্তালানি খরচ করবে তা নির্ভর করে এর ভরের ওপর। ভারী নড়্গত্ররা জ্তালানি খরচ করে অনেক দ্রম্নত। তা না করে যে উপায় নেই। এরা বড় এবং উজ্জ্বল। ফলে বিকিরণ করে বেশি পরিমাণ শক্তি। বাড়তি ওজনের কারণে গ্যাসের ঘনত্ব ও তাপমাত্রা যায় বেড়ে। ফলে বেড়ে যায় ফিউশনের হার। যেমন ১০ সৌর ভরের একটি নড়্গত্র এর বেশিরভাগ হাইড্রোজেন মাত্র এক কোটি বছরেই শেষ করে ফেলতে পারে।

এমন ভারী একটি নড়্গত্রের ভবিষ্যত্ কেমন হতে পারে দেখা যাক। বেশিরভাগ নড়্গত্রের জীবন শুরম্ন হয় মূলত হাইড্রোজেন দিয়ে। হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস মানে কেবল একটি প্রোটন। হাইড্রোজেনের ‘দহন’২ প্রক্রিয়ায় দুটো হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস যুক্ত হয়ে হিলিয়াম মৌলের নিউক্লিয়াস গঠিত হয়। এর প্রতিটিতে থাকে দুটি করে প্রোটন ও নিউট্রন। (এর বিসত্মারিত ব্যাখ্যা একটু জটিল আর সেটা আমাদের আপাতত দরকারও নেই) নিউক্লীয় শক্তির সবেচেয় কার্যকরী উত্স হলো হাইড্রোজেন ’দহন’। তবে এটাই একমাত্র উত্স নয়। অভ্যন্ত্মরভাগের তাপমাত্রা যথেষ্ট বেশি হলে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস যুক্ত হয়ে কার্বন গঠন করতে পারে। তারও পরে ফিউশনের মাধ্যমে অক্সিজেন, নিওন ও অন্যান্য মৌল তৈরি হয়। একের পর এক নিউক্লীয় বিক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার মতো প্রয়োজনীয় অভ্যন্ত্মরীণ তাপমাত্রা উত্পন্ন করার কাজ ভারী নড়্গত্ররা করতে পারে। মাঝে মাঝে সে তাপমাত্রা একশ কোটির ওপরেও হয়।

কিন্তু শক্তি ধীরে ধীরে কমতে থাকে। প্রতিটি নতুন মৌল তৈরির সাথে সাথে নির্গত শক্তির পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে। জ্তালানি দ্রম্নত থেকে দ্রম্নততর খরচ হতে থাকে। নড়্গত্রের উপাদান বদলে যেতে থাকে। শুরম্নতে প্রতি মাসে, পরে প্রতি দিন এবং শেষমেষ প্রতি ঘণ্টায়। অভ্যন্ত্মরভাগ দাঁড়ায় পেঁয়াজের মতো। এখানে সত্মরগুলো হলে উত্তাল প্রক্রিযায় ক্রমে ক্রমে গড়ে ওঠা রাসায়নিক মৌলগুলো। বাইরের দিকে আবার নড়্গত্রটি ফুলে-ফেঁপে বড় হয়ে যায়। হয়ে যায় আমাদের পুরো সৌরজগতের চেয়েও বড়। একেই জ্যোতির্বিদরা বলেন লোহিত অতিদানব (red supergiant)।

নিউক্লীয় দহন প্রক্রিয়ার ইতি ঘটে লোহা তৈরির মাধ্যমে। এর নিউক্লীয় গঠনটা বেশ স্থিতিশীল। নিউক্লীয় ফিউশনের মাধ্যমে লোহার চেয়ে ভারী মৌল গঠিত হতে নড়্গত্রের নিজেরই শক্তি ধার করতে হয়। নির্গত করা তো পরের কথা। ফলে লোহা তৈরি হয়ে গেছে মানে একটি নড়্গত্রের এখানেই সমাপ্তি। কেন্দ্রীয় অঞ্চল যখন আর তাপ উত্প্নন করতে না পারবে, দাবার গুটি চলে যাবে মহাকর্ষের হাতে। নড়্গত্রটি হয়ে চরমভাবে ভারসাম্যহীন। পতিত হয় নিজস্ব মহাকর্ষীয় গর্তে।

পরের ঘটনা খুব দ্রুত ঘটে। নড়্গত্রের লোহায় গড়া কেন্দ্র নিউক্লীয় দহনের মাধ্যমে আর কোনো তাপ উত্পাদন করতে পারে না। ফলে ধরে রাখতে ব্যর্থ হয় নিজের ওজন। এত দ্রম্নত গুটিয়ে যায় যে পরমাণুগুলো পর্যন্ত্ম দুমড়ে-মুচড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত্ম কেন্দ্রের ঘনত্ব এত বেড়ে যায় যে একটি আঙ্গুলের মাথায় যে পরিমাণ পদার্থ আঁঁটবে সেটাই প্রায় এক লড়্গ কোটি টন। এ দশায় নড়্গত্রটির কেন্দ্রম্ললের ব্যাস হয় মাত্র দুই শ কিলোমিটার। নিউক্লীয় পদার্থের কাঠিন্যের ফলে এটি লাফালাফি করবে। মহাকর্ষ এত শক্তিশালী যে এই বিশাল ঘটনা ঘটতে সময় লাগবে কয়েক মিলিসেকেন্ড। কেন্দ্রে যেন নাটকের কোনো শেষ নেই। আকস্মিকভাবে তীব্র আলোড়নের মাধ্যমে নাড়্গত্রিক পদার্থের আশপাশের সত্মরগুলো এসে পতিত হয় কেন্দ্রম্ললে। সেকেন্ডে অযুত অযুত বেগে চলে ভেতরের দিকের এই গতি। ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন৩ পদার্থ এসে আঘাত হানে তীব্র ঘন কেন্দ্রম্ললে। কেন্দ্রম্লল হয় হীরার দেয়ালের চেয়েও দৃঢ়। এরপর হয় তীব্র সংঘর্ষ। যার ফলে বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে একটি শক্তিশালী শক ওয়েভ।

শক ওয়েভের সাথে সাথে বিপুল পরিমাণ নিউট্রিনোও নির্গত হয়। নড়্গত্রের সর্বশেষ নিউক্লীয় রূপান্ত্মরের সময় ভেতরের এলাকা থেকে আকস্মিকভাবে বের হয় কণাগুলো। এই রূপান্ত্মরের প্রাক্কালেই নড়্গত্রের পরমাণুর ইলেকট্রন ও প্রোটন মিলিত হয়ে গঠন করে নিউট্রন। ফলে নড়্গত্রের কেন্দ্রম্লল নিউট্রনের এক বিশাল গোলকে পরিণত হয়। শক ওয়েভ ও নিউট্রিনোরা যৌথভাবে নড়্গত্রের বাইরের সত্মরগুলোর দিকে বিপুল পরিমাণ শক্তি পরিবহন করে। এই শক্তি শোষণ করে নড়্গত্রের বাইরের সত্মর বিস্ফোরিত হয়। এক ভয়াবহ নিউক্লীয় বিস্ফোরণ। কয়েক দিন যাবত নড়্গত্রটি হাজার কোটি সূর্যের আলো বিকিরণ করে। কয়েক সপ্তাহ পর আবার ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে যেতে থাকে।

মিল্কিওয়ের মতো আদর্শ গ্যালাক্সিগুলোতে প্রতি শতাব্দীতে দুই কি তিনটি সুপারনোভা দেখা যায়। জ্যোতির্বিদরা বিস্ময় চোখে সেগুলো নথিবদ্ধ করেছেন। এর মধ্যে বিখ্যাত একটি দেখা গিয়েছিল ১০৫৪ সালে। চীনা ও আরব জ্যোতির্বিদরা এটি পর্যবেড়্গণ করেন। অবস্থান ছিল আকাশের কর্কট ম্ললীতে। বিদীর্ণ সেই তারকাটিকে আজ প্রসারণশীল গ্যাসের ছেঁড়া মেঘের মতো লাগে। নাম ক্র্যাব নেবুলা বা কাঁকড়া নীহারিকা।

১৯৮৭এ সুপারনোভার বিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্বে বহু অদৃশ্য নিউট্রিনো ছড়িয়ে পড়ে। এই নিঃসরণের তীব্রতা ছিল মারাত্মক। পৃথিবীর প্রতি বর্গ সেন্টিমিটার জায়গায় এক অযুত কোটি নিউট্রিনো আঘাত হানে। যদিও বিস্ফোরণস্থল থেকে পৃথিবীর দূরত্ব ১ লড়্গ ৭০ হাজার আলোকবর্ষ। পৃথিবীর মানুষ এই খবরটা জানতেও পারেনি যে অন্য একটি ছায়াপথ থেকে আসা বহু ট্রিলিয়ন কণা তাদের শরীর ভেদ করে চলে গেছে। কিন্তু কামিওকা ও ওহাইয়ো প্রোটন-ড়্গয় ডিটেক্টরগুলো ১৯ টি নিউট্রিনোকে ধরে ফেলে। এই ব্যবস্থা না থাকলে নিউট্রিনোগুলো সবার অজান্ত্মে চলে যেত। যেমনটি গিয়েছিল ১০৫৪ সালে।

সুপারনোভা মানেই একটি নড়্গত্রের মৃত্যু। তবে বিস্ফোরণের একটি ভালো দিকও আছে। বিপুল পরিমাণ শক্তি অবমুক্ত হবার ফলে নড়্গত্রের বাইরের সত্মরগুলো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। উত্তাপ এত বেশি হয় যে কিছু সময়ের জন্যে আবারও নিউক্লীয় ফিউশন বিক্রিয়া হতে পারে। এ বিক্রিয়া শক্তি নির্গত করার বদলে শোষণ করে। সবচেয়ে উত্তাল এই নাড়্গত্রিক চুলিস্নতেই লোহার চেয়ে ভারী মৌলগুলো প্রস্তুত হয়। এই যেমন, সোনা, সিসা, ইউরেনিয়াম ইত্যাদি। কার্বন, অক্সিজেনের মতো নিউক্লীয় সংশেস্নষের প্রাথমিক পর্যায়ে তৈরি হালকা মৌলগুলোর সাথে সাথে এই ভারী মৌলগুলোও মহাকাশে নিড়্গিপ্ত হয়। মিশে যায় অন্য সুপারনোভাদের নিড়্গিপ্ত এমন অসংখ্য পদার্থের সাথে। পরবর্তী সময়ে এই ভারী পদার্থগুলো নতুন প্রজন্মের নড়্গত্র ও গ্রহে পরিণত হয়। এই মৌলগুলো প্রস্তুত বা নিড়্গিপ্ত না হলে পৃথিবীর মতো কোনো গ্রহ তৈরি হত না। প্রাণ তৈরির কাঁচামাল কার্বন ও অক্সিজেন, ব্যাংকে রড়্গিত সোনা, ছাদের সিসার আসত্মর, নিউক্লীয় চুলিস্নতে ইউরেনিয়ামের রড—পৃথিবীর এই সব কিছু হয়েছে নড়্গত্রদের জীবনের বিনিময়ে। আমাদের সূর্যের জন্মের আগেই যাদের জীবনের ইতি ঘটেছিল। ভাবতেই কেমন লাগে, আমাদের শরীর যে উপাদান দিয়ে তৈরি তা বহু কাল ধরে মৃত নড়্গত্রের নিউক্লীয় ছাই দিয়ে গড়া।

সুপারনোভা বিস্ফোরণে নড়্গত্র সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায় না। তুমুল উত্তেজনার মধ্য দিয়ে বেশিরভাগ পদার্থ বেরিয়ে গেলেও সঙ্কুচিত যে কোর বা কেন্দ্রম্লল ঐ ঘটনার সূত্রপাত করেছিল, সেটি থেকে যায় নিজের অবস্থানেই। তবে এর নিয়তিও যে কী হবে সেটা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। কোরের ভর যদি খুব কম হয়, এই ধরম্নন এক সৌর ভর, তাহলে এটি ছোট শহরের সাইজের একটি নিউট্রনের গোলকে পরিণত হবে। খুব সম্ভব এই নিউট্রন নড়্গত্রটি উন্মত্তভাবে ঘুরতে থাকবে। সম্ভবত প্রতি সেকেন্ডে ১০০০ বার। মানে এর পৃষ্ঠে ঘুর্ণন বেগ হবে আলোর বেগের ১০ শতাংশ। এর কারণ হলো সঙ্কোচন। যার ফলে অল্প ঘূর্ণন নিয়ে শুরম্ন হওয়া নড়্গত্রটিও জোরে ঘুরতে থাকে। বরফের ওপর স্কেটিং করা অবস্থায় হাত গুটিয়ে নিলেও ঠিক একই কারণে অপেড়্গাকৃত জোরে ঘুরা যায়। এভাবে জোরে আবর্তনশীল বহু নিউট্রন নড়্গত্র জ্যোতির্বিদরা খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু আবর্তন ধীরে ধীরে কমে আসে। কারণ, বস্তুটি শক্তি হারাতে থাকে। যেমন কাঁকড়া নীহারিকার মধ্যখানে অবস্থিত নিউট্রন নড়্গত্রটি এখন সেকেন্ডে মাত্র ৩৩ বার ঘুরে।

তবে কোরের ভর যদি আরেকটু বেশি হয়, এই ধরম্নন কয়েক সৌর ভর, তাহলে এটি নিউট্রন হয়েই হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না। মহাকর্ষ এড়্গেত্রে অনেক শক্তিশালী। নিউট্রন দিয়ে গড়া বস্তু বর্তমানে জানা সবচেয়ে দৃঢ় বস্তু। কিন্তু এই নিউট্রনও বাড়তি সঙ্কোচন ঠেকাতে পারে না। ঘটনা গড়াতে থাকে আরও দারম্নণ পরিণতির দিকে। সুপারনোভার চেয়েও উত্তাল। নড়্গত্রের কোর গুটিয়ে যেতেই থাকে। এক মিলিসেকেন্ড এরও কম সময়ে এটি একটি বস্ন্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বর বানিয়ে ফেলে। হারিয়ে যায় দৃশ্যমান জগত্ থেকে।

তার মানে, ভারী নড়্গত্রদের নিয়তি হলো ছিন্নবিছিন্ন হয়ে যাওয়া। আর ধ্বংসাবশেষ হিসেবে থেকে যায় একটি নিউট্রন নড়্গত্র বা একটি বস্ন্যাক হোল। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে নিড়্গিপ্ত গ্যাসের দল। কে জানে কত কত নড়্গত্র এখণ পর্যন্ত্ম এই পরিণতি বরণ করেছে। কিন্তু শুধু মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতেই এমন বিলিয়ন বিলিয়ন নাড়্গত্রিক ধ্বংসাবশেষ পড়ে থাকতে পারে।

ছোট বেলায় আমি খুব ভয় পেতাম যে সূর্য হয়ত বিস্ফোরিত হয়ে যেতে পারে। আসলে কিন্তু ভয়ের কিছু নেই। এটি কখনও সুপারনোভা হবে না। এর ভর অত বেশি নয়। ভারী নড়্গত্রের তুলনায় হালকাগুলোর নিয়তি এত উত্তাল নয়। প্রথম কথা হলো, এড়্গেত্রে নিউক্লীয় প্রক্রিয়ায় জ্তালানি ব্যয় হয় অনেক কম গতিতে। ন্যূনতম নাড়্গত্রিক ভরের একটি বামন নড়্গত্র এক ট্রিলিয়ন বছর যাবত একই হারে আলো দিয়ে যেতে থাকতে পারে। তার ওপর একটি হালকা নড়্গত্রের অভ্যন্ত্মরীণ তাপমাত্রা এত বেশি হওয়া সম্ভব নয় যে এটি লোহাও সংশেস্নষ করবে। ফলে এতে উত্তাল অন্ত্মঃস্ফোটন ঘটতে পারে না।

সূর্য স্বল্প ভরের নড়্গত্রের একটি আদর্শ উদাহরণ। হাইড্রোজেন জ্তালানি খরচ ও হিলিয়ামে রূপান্ত্মর হচ্ছে খুব ধীরেসুস্থে। হিলিয়াম মূলত থাকে কেন্দ্রীয় কোরের দিকে। নিউক্লীয় বিক্রিয়ার কথা বললে কোরকে নিষ্ক্রিয়ই বলতে হবে। ফিউশন সংঘটিত হয় কোরের পৃষ্ঠে। ফলে মহাকর্ষীয় বলের সঙ্কোচন রোধ করার জন্যে সূর্যের যে পরমািণ তাপ প্রয়োজন কোর তা তৈরিতে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। সঙ্কোচন ঠেকাতে নতুন হাইড্রোজেনের সন্ধানে সূর্যকে এর নিউক্লীয় কর্মকা্ল বাইরের দিকে ছড়িয়ে দিতে হয়। এদিকে হিলিয়াম কোর ক্রমেই ছোট হতে থাকে। অভ্যন্ত্মরীণ এসব পরিবর্তনের ফলে সময়ের সাথে সাথে সূর্যের চেহারা ক্রমশ বদলে যাবে। এটি ফুলে-ফেঁপে উঠবে। কিন্তু পৃষ্ঠ কিঞ্চিত ঠা্লা হবে। দেখা যাবে হালকা লাল আভা। এ অবস্থা চলতে থাকবে যত দিন না সূর্য লোহিত দানবে (red giant) পরিণত হয়। এ সময় সম্ভবত এটি বর্তমান সময়ের পাঁচ শ গুণ বড় হবে। জ্যোতির্বিদদের কাছে লোহিত দানব একটি পরিচিত নাম। আকাশের বেশ কটি পরিচিত উজ্জ্বল নড়্গত্রই এই শ্রেণির নড়্গত্র। যেমন, আলদাবেরান (Aldebaran), আদ্রা (Betelgeuse) ও স্বাতী (Arcturus)। স্বল্প ভরের নড়্গত্রদের সমাপ্তির শুরম্ন হয় লোহিত দানব দশার মাধ্যমে।

লোহিত দানবরা অপেড়্গাকৃত শীতল হয়। তবে সাইজ বড় হবার কারণে এদের বিকিরণ পৃষ্ঠ হয় বিশাল। তার মানে সার্বিক দীপ্তি বা (luminosity) ঔজ্জ্বল্যও বেশি। এ সময় কপাল পুড়বে সূর্যের গ্রহগুলোর। আরও প্রায় চার শ কোটি বছর পর বর্ধিত তাপ প্রবাহ আঘাত হানবে এদের ওপর। তার অনেক আগেই পৃথিবী বসবাাসের অযোগ্য হয়ে যাবে। সাগর শুকিয়ে যাবে আর উড়ে যাবে বায়ুম্লল। এরপর সূর্য আরও বিসত্মৃত হবে। গ্রাস করবে বুধ গ্রহকে। তারপর শুক্র। পরিশেষে পৃথিবীকেও নিয়ে নিবে আগ্রাসী পেটের ভেতর। আমাদের গ্রহখানি পরিণত হবে অঙ্গারে। এত দহন সহ্য করেও কিন্তু যাবে না কড়্গপথ ছেড়ে। সূর্যের লাল-উষ্ণ গ্যাসের ঘনত্ব এত কমে যাবে যে সেটা শূন্য স্থানের কাছাকাছি হবে। ফলে পৃথিবীর গতি হবে প্রায় মসৃণ।

এহাবিশ্বে আমাদের অসিত্মত্বের কারণ সূর্যের মতো এমন অসাধারণ স্থিতিশীল নড়্গত্র। যেটি কয়েক বিলিয়ন বছর ধরে অবিরত জ্তলতে পারে। যে সময়টা জীবনের স্পন্দন তৈরি ও বিকাশের জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু লোহিত দানব দশায় এই স্থিতিশীলতার ইতি ঘটবে। সূর্যের মতো নড়্গত্রের জীবনের পরের ধাপগুলো জটিল, অনির্দিষ্ট ও উত্তাল। হঠাত্ করে বদলে যায় আচরণ ও চেহারা। বয়স্ক নড়্গত্ররা স্পন্দিত হতে হতে বা গ্যাসের খোলস ছাড়াতে ছাড়াতে নিযুত নিযুত বছর পার করে দিতে পারে। নড়্গত্রের কোরের হিলিয়াম দহন সংঘটিত করে কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন তৈরি করতে পারে। ফলে নড়্গত্রটি আরও কিছু দিন বেেঁচ যাবার জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তি পেয়ে যায়। বাইরের সত্মরটিকে মহাশূন্যে নিড়্গেপ করার পরে নড়্গত্রটির কাছে কার্বন-অক্সিজেনে গড়া কোর ছাড়া আর কিছু থাকে না।

জটিল কার্যক্রমের এই যুগ শেষ হলে স্বল্প ও মাঝারি ভরের নড়্গত্ররা শেষ পর্যন্ত্ম মহাকর্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে। হয় সঙ্কুচিত। এই সঙ্কোচন কারও কথা মানে না। শেষ পর্যন্ত্ম নড়্গত্রের সাইজ গ্রহের সমান করে তবে ছাড়ে। এ অবস্থায় বস্তুটিকে জ্যোতির্বিদরা বলেন শ্বেত বামন (white dwarf)। সাইজ ছোট হবার কারণে শ্বেত বামনরা খুব অনুজ্জ্বলও। যদিও তাদের পৃষ্ঠ তাপমাত্রা হতে পারে সূর্যের চেয়েও বেশি। কোনোটিকেই টেলিস্কোপ ছাড়া পৃথিবী থেকে দেখা যায় না।

দূর ভবিষ্যতে শ্বেত বামনে পরিণত হওয়াটাই লেখা আছে আমাদের ভাগ্যে। এ অবস্থায় পৌঁছার পর বহু বিলিয়ন বছর ধরে উত্তপ্ত থাকবে সূর্য। এর বিশাল অবয়ব এত শক্ত হবে যে এটি এর অভ্যন্ত্মরীণ তাপ খুব দড়্গতার সাথে আটকে রাখবে। আমাদের জানা সেরা তাপ রোধকের চেয়েও ভালোভাবে। কিন্তু ভেতরের নিউক্লীয় চুলিস্নতে যেহেতু চিরদিনের জন্যে লালবাতি জ্তলে গেছে, তাই ভেতরে আর কোনো বাড়তি জ্তালানি অবশিষ্ট নেই। ফলে তারকাটি থেকে ধীরে ধীরে শীতল মহাশূন্যের গভীরের দিকে যে তাপীয় বিকিরণ নির্গত হচ্ছে সেটা পূরণ করা সম্ভব নয়। খুব ধীরে বামন ধ্বংসাবশেষটি শীতল ও অনুজ্জ্তল হয়ে যাবে। যদিও এক সময় তা ছিল আমাদের তেজস্বী সূর্য। আর একটি পরিবর্তন বাকি। এবার এটি ক্রমশ একটি কঠিন স্ফটিকে (crystal) পরিণত হবে। দৃঢ়তা হবে অসামান্য। শেষে এটি একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। নিরবে মিশে যাবে মহাশূন্যের অন্ধকারে।

অনুবাদকের নোট:

1. তাপমাত্রার ভিত্তিতে নড়্গত্রের শ্রেণিবিভাগে O, B, A, F, G, K ও M বর্ণগুলো ব্যবহার করা হয়। এ ক্রমানুসারে O শ্রেণির নড়্গত্র সবচেয়ে উষ্ণ। আর M শ্রেণির নড়্গত্র সবচেয়ে কম উষ্ণ।
2. সাধারণ অর্থে দহন বলতে বোঝায় কোনো মৌলের সাতে অক্সিজেনে বিক্রিয়া। তবে সেটা হলো এত ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া। এখানে কথা হচ্ছে নিউক্লীয় বিক্রিয়া নিয়ে। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নতুন কোনো মৌল উত্পন্ন হতে পারে না। কিন্তু নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় হয় এ কাজটিই।
3. এক ট্রিলিয়ন সমান এক লড়্গ কোটি, মানে ১,০০০,০০০,০০০,০০০।

পঞ্চম অধ্যায়

অন্ধকার অমানিশা

অযুত নড়্গত্রের আলো নিয়ে জ্তলে আকাশগঙ্গা ছায়াপথ (Milky Way galaxy)। প্রতিটি নড়্গত্রের গলায় ঝুলছে মৃত্যুর পরোয়ানা। আজ আমরা যাদেরকে দেখছি, এক হাজার কোটি বছরের মধ্যে তাদের বেশিরভাগই দৃষ্টি থেকে হারিয়ে যাবে। মারা যাবে জ্তালানির অভাবে। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের কল্যাণে।

কিন্তু আকাশগঙ্গায় তবু নড়্গত্রের আলো থাকবে। কারণ মৃত্যুর সাথে সাথে আবার তাদের স্থলে নতুন নড়্গত্রেরও জন্ম হয়। ছায়াপথের সর্পিল বাহুতে থাকা গ্যাসীয় মেঘ সঙ্কুচিত হয়, মহাকর্ষের প্রভাবে গুটিয়ে আসে ও আলাদা আলাদা এক গুচ্ছ নড়্গত্রের জন্ম দেয়। আমাদের সূর্যও এমন একটি বাহুতেই অবস্থিত। কালপুরম্নষ তারাম্ললের দিকে এক নজর তাকালেও এমন একটি নাড়্গত্রিক নার্সারি খুঁজে পাওয়া যায়। কালপুরম্নষের তলোয়ারের কেন্দ্রের ঘোলাটে আলোখানা কোনো তারকা নয়। এটি একটি নেবুলা বা নীহারিকা। বিশাল এক গ্যাসীয় মেঘ। সাথে আছে উজ্জ্বল নতুন নতুন নড়্গত্র। দৃশ্যমান আলোর বদলে অবলোহিত বিকিরণ দিয়ে জ্যোতির্বিদরা এই নীহারিকায় কিছু নড়্গত্রকে তাদের জন্মের একেবারে শুরম্নর দশাগুলোতে পর্যবেড়্গণ করেছেন। এরা এখনও গ্যাস ও ধুলোয় ঢেকে আছে।

যত দিন যথেষ্ট গ্যাস আছে, আমাদের ছায়াপথের সর্পিল বাহুগুলোতে নড়্গত্রের জন্ম হতেই থাকবে। ছায়াপথের গ্যাসগুলোর কিছু অংশ প্রারম্ভিক দশায় আছে। এখনও যেগুলো নড়্গত্রে পরিণত হতে পারেনি। কিছু অংশ আবার সুপারনোভা বিস্ফোরণের মাধ্যমে বিভিন্ন নড়্গত্র থেকে এসেছে। অথবা এসেছে নাড়্গত্রিক বায়ু, ছোট ছোট ঝড় ও অন্যান্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। নিঃসন্দেহে এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি অনির্দিষ্ট সময় ধরে চলতে পারে। পুরাতন নড়্গত্ররা মারা গিয়ে ও সঙ্কুচিত হয়ে শ্বেত বামন, নিউট্রন নড়্গত্র বস্ন্যাক হোল হয়ে গেলে আর আন্ত্মঃনাড়্গত্রিক স্থানে নতুন পদার্থ সরবরাহ করতে পারবে না। ধীরে ধীরে প্রারম্ভিক গ্যাসগুলো সব নড়্গত্র হতে থাকবে। এক সময় তাও শেষ হয়ে যাবে। শেষের দিকের এই নড়্গত্রগুলোও জীবনের পাঠ চুকিয়ে মারা গেলে ছায়াপথ খুব অনুজ্জ্বল হয়ে যাবে। তবে কাজটা হুট করে হয়ে যাবে না। ছোট ও নতুন নড়্গত্ররা তাদের নিউক্লীয় দহন সম্পূর্ণ করে গুটিয়ে শ্বেত বামন হতে বহু বিলিয়ন বছর সময় লাগবে। কিন্তু প্রক্রিয়া ধীর হলেও বিভীষিকাময় অনন্ত্ম রাত একদিন নেমে আসবেই।

চির প্রসারণশীল মহাশূন্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাকি সব ছায়াপথের কপালেও ঐ একই জিনিস লেখা আছে। নিউক্লীয় শক্তির কল্যাণে বর্তমান মহাবিশ্ব জ্তলজ্তল করে আলো দিচ্ছে। কিন্তু এক দিন এই মূল্যবান উত্স ফুরিয়ে যাবে। আলোর যুগ চিরদিনের জন্যে বিদায় হবে।

তবে মহাজাগতিক আলো ফুরিয়ে গেলেই মহাবিশ্ব মারা যাবে না। কারণ শক্তির উত্স আছে আরেকটি, যা নিউক্লীয় বিক্রিয়ার চেয়েও শক্তিশালী। পারমাণবিক সত্মরে চিন্ত্মা করলে প্রকৃতির দুর্বলতম বল মহাকর্ষ। কিন্তু মহাজাগতিক মাপকাঠিতে এই বলটিই রাজা। এর প্রভাব হতে পারে খুব মৃদু। কিন্তু সেটা কাজ করে খুব নাছোড়বান্দার মতো। বিলিয়ন বিলিয়ন বছর যাবত নড়্গত্ররা নিউক্লীয় দহনের মাধ্যমে নিজেদের ওজনকে ধরে রেখেছে। কিন্তু মহাকর্ষ এত দিন শুধু ওত পেতে ছিল।

একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসের দুটি প্রোটনের মধ্যে ক্রিয়াশীল মহাকর্ষ বল সবল নিউক্লীয় বলের এক শ কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি ভাগের এক ভাগ (১০-৩৭)। কিন্তু মহাকর্ষ বলটি ক্রমবর্ধমান। প্রতিটি বাড়তি প্রোটন বাড়তি ওজনের যোগান দেয়। শেষ পর্যন্ত্ম মহাকর্ষ বল আগ্রাসী হয়ে দাঁড়ায়। প্রবল শক্তির পেছনে এই তীব্র বলই মূল ভূমিকা রাখে।

মহাকর্ষের ড়্গমতা সবচেয়ে ভালোভাবে প্রদর্শন করে বস্ন্যাক হোল। এখানে জয় হয়েছে বস্ন্যাক হোলের। সঙ্কোচনের ফলে নড়্গত্রের আয়তন হয়ে গেছে শূন্য। সমযের অসীম বিকৃতির আকারে আশেপাশের স্থানকালে সে ঘটনার একটি ছাপ পড়েছে। বস্ন্যাক হোল নিয়ে একটি দারম্নণ মানস পরীড়্গা (thought experiment) আছে। মনে করম্নন, অনেক দূর থেকে একটি ছোট, যেমন ১০০ গ্রাম ভরের বস্তুকে বস্ন্যাক হোলে ফেলে দেওয়া হলো। বস্তুটি দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যাবে এবং চিরতরে নাগালের বাইরে চলে যাবে। তবে বস্ন্যাক হোলের কাঠামো এই ঘটনার একটি সাড়্গ্য বহন করবে। বস্তুটি গলাধঃকরণ করে বস্ন্যাক হোলের সাইজ খুব সামান্য পরিমাণ বড় হবে। হিসাব করে দেখা গেছে, বস্তুটিকে অনেক দূর থেকে ফেলা হলে বস্ন্যাক হোলের ভর যতটুকু বাড়বে তা বস্তুটির মূল ভরের সমপরিমাণ। তার মানে, ভর বা শক্তির এতটুকুও অন্য কোনো দিকে যাবে না।

এবার অন্য একটি পরীড়্গা। ভরটিকে এবার ধীরে ধীরে বস্ন্যাক হোলের দিকে নামানো হচ্ছে। এটা করার জন্য বস্তুটির সাথে একটি রশি লাগাতে হবে। এরপর সেটাকে পুলির ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে ড্রামের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। ড্রামের মাধ্যমে আসেত্ম আসেত্ম রশির প্যাঁচ খোলা হবে। (চিত্র ৫.১ দেখুন: আমরা ধরে নিচ্ছি রশিটি প্রসারিত হবে না। কোনো ওজনও থাকবে না। বাসত্মবে এ দুটোর কোনোটিই সম্ভব নয়, কিন্তু জটিলতা পরিহারের জন্যে ধরে নিতে হচ্ছে) ভরটিকে নিচে নামানো হলে এটি শক্তি সরবরাহ করতে পারবে। যেমন ড্রামের সাথে যুক্ত বৈদ্যুতিক জেনারেটর চালু করার মাধ্যমে। বস্তুটি বস্ন্যাকে হোলের পৃষ্ঠের যত বেশি নিকটবর্তী হবে, বস্তুটির ওপর হোলের মহাকর্ষীয় টান তত শক্তিশালী হবে। নিচের দিকে টান যত বাড়বে, বস্তুটি জেনারেটর দিয়ে ততই বেশি কাজ করাতে পারবে। সহজেই হিসাব করা যায়, বস্তুটি বস্ন্যাকে হোলের পৃষ্ঠে পৌঁছতে পৌঁছতে জেনারেটরকে কী পরিমাণ শক্তি সরবরাহ করবে। আদর্শ ড়্গেত্রে এর উত্তর হবে, বস্তুটির সমগ্র নিশ্চল ভর-শক্তি। (নিশ্চল ভরের ধারণা ৩১ নং পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হয়েছে।)

আইনস্টাইনের বিখ্যাত E=mc2 সূত্রটি মনে আছে নিশ্চয়ই। m ভরের একটি বসত্ম থেকে mc2 পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়। তত্ত্ব বলছে, বস্ন্যাক হোল ব্যবহার করে ভাগ্য ফেরানো সম্ভব। ১০০ গ্রাম ভরের বস্তু থেকেই পাওয়া যাবে তিন শ কোটি কিলোওয়াট-ঘণ্টা (মানে তিন শ কোটি ইউনিট বিদ্যুত্-অনুবাদক) বিদ্যুত্। তুলনার জন্যে বলে রাখি, সূর্য যখন ১০০ গ্রাম জ্তালানি ফিউশনের মাধ্যমে পোড়ায়, তখন এর এক ভাগেরও কম শক্তি সরবরাহ করে। ফলে তত্ত্ব বলছে, মহাকর্ষীয় উপায়ে যে শক্তি পাওয়া যাবে তা নড়্গত্রের শক্তি জোগানো তাপ-নিউক্লীয় ফিউশনের এক শ গুণ।

চিত্র ৫.১

আদর্শ এই মানস পরীড়্গায় একটি রশির সাহায্যে একটি বস্তুকে ধীরে ধীরে বস্ন্যাক হোলের পৃষ্ঠের দিকে নামানো হয়। ব্যবহার করা হয় একটি পুলি ব্যবস্থা (ফিক্সার দেখানো হয়নি)। ফলে, নিচের নামা বস্তুটি কাজ করতে থাকে ও বক্সে শক্তি পাঠাতে থাকে। বস্তুটি যতই বস্ন্যাক হোলের পৃষ্ঠের কাছাকাছি হতে থাকে, পাঠানো মোট শক্তির পরিমাণ ততই বস্তুটির সমগ্র ভর-শক্তির পরিমাণের সমান হতে থাকে।

এখানে যে দুটো কৌশলের কথা বলা হলো তার দুটোই একেবারে অবাসত্মব। নিঃসন্দেহে বস্ন্যাক হোলে বস্তুরা পড়ে বিরতিহীনভাবে। শক্তি উদ্ধার করার মতো করে সুন্দর উপায়ে পুলি থেকে ঝুলে থাকে না। বাসত্মবে নিশ্চল ভরের শূন্য ও এক শ ভাগের মাঝামাঝি মানের কোনো শক্তি পাওয়া যাবে। প্রকৃত মানটা নির্ভর করবে ভৌত পরিস্থিতির ওপর। গত কয়েক দশকে জ্যোতির্পদার্থবিদেরা বিভিন্ন রকম কম্পিউটার সিমুলেশন১ ও গাণিতিক মডেল বিশেস্নষণ করে দেখেছেন। উদ্দেশ্য হলো পেঁচিয়ে বস্ন্যাক হোলের ভেতরে চলে যাওয়ার সময় গ্যাসের অবস্থা কেমন হয় এবং কী পরমািণ ও কীভাবে শক্তি বিমুক্ত হয় তা জানা। এখানে যে ভৌত প্রক্রিয়াগুলো সংঘটিত হয় সেগুলো বেশ জটিল। তবুও এটা বোঝা যাচ্ছে যে এসব জায়গা থেকে বিপুল পরিমাণ মহাকর্ষীয় শক্তি বেরিয়ে আসতে পারে।

একটি পর্যবেড়্গণ থেকে করা সম্ভব হাজার হাজার হিসাব-নিকাশ। এভাবে বস্তু গিলে খাবার সময় সম্ভাব্য বস্ন্যাক হোল খুঁজে পাওযার জন্যে জ্যোতির্বিদরা বড় আকারে অনুসন্ধান চালিয়েছেন। এখন পর্যন্ত্ম অকাট্যভাবে কোনো বস্ন্যাক হোল পাওয়া যায়নি। তবে সিগনাস বা বকম্ললীতে অবস্থিত একটি সিস্টেমকে বেশ সম্ভাবনাময় হিসেবে দেখা যাচ্ছে। নাম সিগনাস এক্স-১। অপটিকেল টেলিস্কোপের মাধ্যমে একটি বৃহত্ ও উত্তপ্ত নীল দানব (blue giant) শ্রেণির তারকা দেখা গেছে। রং নীল বলেই নাম নীল দানব হয়েছে। বর্ণালী বিশেস্নষণের মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে তারকাটি একা নয়। নিয়ম মেনে মোচড় খাচ্ছে এটি। তার মানে, আশেপাশের কোনো বস্তুর মহাকর্ষ একে সময় সময় আকর্ষণ করছে। তার মানে, নিশ্চিত করেই বলা চলে, এই নড়্গত্র এবং অপর বস্তুটি একে অপরকে খুব কাছ থেকে প্রদড়্গিণ করছে। কিন্তু অপটিকেল টেলিস্কোপে অপর নড়্গত্রটির দেখা নেই। হয় এটি কোনো বস্ন্যাক হোল, নয়ত খুব অনুজ্জ্বল কোনো ড়্গুদ্র তারা। ফলে মনে যাচ্ছে এটি বস্ন্যাক হোল হতে পারে। তবে নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।

অদৃশ্য বস্তুটির ভর থেকে পাওয়া যায় আরেকটি ইঙ্গিত। এটা নিউটনের সূত্র থেকেই বলে দেওয়া সম্ভব। এর জন্যে শুধু দরকার নীল দানব তারাটির ভর জানা। নড়্গত্রের ভর ও রং এর মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলে সেটাও সহজেই বের করে ফেলা যায়। নীল তারারা উত্তপ্ত। ফলে তাদের ভর বেশি। হিসাব থেকে ধারণা করা যায় যে অদৃশ্য সঙ্গী তারকাটির ভর কয়েক সৌর ভরের সমতুল্য। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এটি সাধারণ ছোট ও অনুজ্জ্বল কোনো তারা নয়। তার মানে এটি কোনো সঙ্কুচিত ভারী নড়্গত্রই হবে। শ্বেত বামন, নিউট্রন নড়্গত্র বা বস্ন্যাক হোল। কিন্তু কিছু মৌলিক ফিজিকেল কারণে একে এত ভারী ড়্গুদ্র কোনো বস্তু শ্বেত বামন বা নিউট্রন নড়্গত্র হতে পারে না। এড়্গেত্রে থাকার কথা তীব্র মহাকষীয় ড়্গেত্র, যা বস্তুটিকে গুটিয়ে ফেলতে সচেষ্ট থাকবে। সম্পূর্ণ সঙ্কুচিত হয়ে বস্ন্যাক হোল হয়ে যাওয়া ঠেকানো যাবে যদি কোনো প্রকার অভ্যন্ত্মরীণ চাপ কাজ করে। যেটা মহাকর্ষের সঙ্কোচনের বিপরীত দিকে কাজ করবে। কিন্তু সঙ্কুচিত বস্তুটির ভর যদি হয় কয়েক সৌর ভরের সমান, তবে কোনো বলের পড়্গেই এর দুমড়ে যাওয়া ঠেকানো সম্ভব নয়। এবং নড়্গত্রটির কোর যদি দুমড়ানো ঠেকানোর মতো দৃঢ় হতো, তাহলে বস্তুটিতে শব্দের বেগ আলোর বেগের চেয়ে বেশি হয়ে যেত। কিন্তু এটা বিশেষ আপেড়্গিকতার বিরম্নদ্ধে যাচ্ছে। ফলে বেশিরভাগ পদার্থ জ্যোতির্বিদের মতে এসব পরিস্থিতিতে বস্ন্যাক হোলের জন্ম অনিবার্য।

সিগনাস এক্স-১ সিস্টেমে বস্ন্যাক হোল থাকার সপড়্গে নিশ্চিত প্রমাণ এসেছে আরেকটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যবেড়্গণ থেকে। এর নাম এক্স-১ দেওয়ার কারণ সিস্টেম এক্স-রে (রঞ্জন রশ্মি) এর একটি শক্তিশালী উত্স। কৃত্রিম উপগ্রহে থাকা সেন্সরের মাধ্যমে শনাক্ত করা যায় সেই রশ্মি। সিগনাস এক্স-১ এর অদৃশ্য বস্তুটিকে বস্ন্যাক হোল ধরে নিলে তাত্ত্বিক নমুনা এই এক্স-রেকে খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। বস্ন্যাক হোলের পরিমাপকৃত মহাকর্ষ ড়্গেত্র এতই শক্তিশালী যে এটি নীল দানব তারাটি থেকে পদার্থ খুবলে নিতে পারে। ছিনতাই করা গ্যাস চলে যায় বস্ন্যাক হোলের দিকে। চিরকালের জন্যে বিস্মৃতির অতলে। সিস্টেমের ঘূর্ণনের কারণে পতনশীল পদার্থগুলো বস্ন্যাক হোলের চারপাশে পাক খাবে। তৈরি হবে চাকতির মতো একটি আকৃতি। এমন একটি চাকতির পড়্গে পুরোপুরি স্থিতিশীল হওয়া সম্ভব নয়। কারণ কেন্দ্রের দিকে থাকা পদার্থ প্রান্ত্মের দিকে অবস্থিত পদার্থের তুলনায় অনেক দ্রম্নত প্রদড়্গিণ করবে। সান্দ্র বল২ এই বিষম ঘূর্ণনকে মসৃণ করার চেষ্টা করবে। ফলে গ্যাসের উত্তাপ বেড়ে যাবে। এতে বেশি যে সেটা সাধারণ আলোর বদলে এক্স-রে নির্গত করবে। এতে করে গ্যাসের যে কড়্গীয় শক্তি ব্যয় হবে তার ফলে তা ধীরে ধীরে সর্পিল পথে বস্ন্যাক হোলের দিকে প্রবেশ করবে।

ফলে সিগনাস এক্স-১ সিস্টেমে বস্ন্যাক হোল থাকার প্রমাণ দীর্ঘ এক সারি যুক্তির ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। কাজে লাগছে পর্যবেড়্গণ ও তত্ত্ব দুটোই। জ্যোতির্বিদ্যার গবেষণা বর্তমান সময়ে এমনই হয়। একটিমাত্র প্রমাণ জোরালো ভূমিকার রাখতে পারে না। সিগনাস এক্স-১ ও একই রকম আরও অনেকগুলো সিস্টেম নিয়ে যাচাই-বাছাই করে মনে হচ্ছে বস্ন্যাক হোল আছে। নিঃসেন্দেহে বস্ন্যাকে হোলের ব্যাখ্যাটিই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও নির্ভেজাল।

আরও বড় বস্ন্যাকরা এর চেয়েও দর্শনীয় কর্মকা্ল করতে পারে। বর্তমানে এ সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্তল যে বেশির ছায়াপথের কেন্দ্রেই সুপারম্যাসিভ বা অতিভারী বস্ন্যাক হোল রয়েছে। এর প্রমাণ হলো, এসব ছায়াপথের কেন্দ্রম্ললের তারাগুলোর দ্রম্নত চলাচল। দেখে মনে হচ্ছে তারাগুলো একটি তীব্র আকর্ষণধর্মী ও খুব ড়্গুদ্র বস্তুর দিকে চলে যাচ্ছে। হিসাব-নিকাশ থেকে এ রকম সম্ভাব্য বস্তুদের ভর এক কোটি থেকে এক শ কোটি পর্যন্ত্ম পাওয়া গেছে। ফলে আশেপাশের যেকোনো বিচ্ছিন্ন বস্তুকে গোগ্রাসে গিলবে এরা। সম্ভবত নড়্গত্র, গ্রহ, গ্যাস, ধুলো—কেউই এ দানবদের থাবা থেকে বাঁচতে পারে না। এই পতন প্রক্রিয়ার উন্মাদনা কোনো কোনো ড়্গেত্রে পুরো ছায়াপথের কাঠামোই বদলে দেয়। সক্রিয় ছায়াপথ কেন্দ্রের (active galactic nuclei) বহু রূপভেদের সাথে পরিচয় আছে জ্যোতিবিদদের। কোনো কোনো ছায়াপথের চেহারা দেখে তো মনে হয় মাত্র বিস্ফোরণ ঘটল। কিছু কিছু আবার বেতার তরঙ্গ, এক্স-রে বা শক্তির অন্য রূপের শক্তিশালী উত্স। তবে সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো ঘটনা হলো, কিছু কিছু গ্যালাক্সি আবার গ্যাসের তীব্র জেট বা ফোয়ারা নিড়্গেপ করে। এবং এই ফোয়ার দৈর্ঘ্য হাজার হাজার এমনকি মিলিয়ন মিলিয়ন মাইল জুড়েও বিসত্মৃত থাকে। এদের কোনো কোনোটির শক্তির উদগীরণ খুবই বিস্ময়কর। যেমন বহু দূরের কোনো কোনো কোয়াসার মাত্র এক আলোকবর্ষ চওড়া এলাকা থেকে হাজার হাজার গ্যালাক্সির সমান শক্তি উদগীরণ করতে পারে। ফলে দূর থেকে দেখে এদেরকে নড়্গত্রের মতো লাগে। কোয়াসার নামটাই কোয়াসি-স্টেলার এর সংড়্গিপ্ত রূপ। মানে নড়্গত্রের মতো বস্তু।

বহু জ্যোতির্বিজ্ঞানীর বিশ্বাস, তীব্রভাবে আলোড়িত এসব বস্তুর কেন্দ্রে পরিচালকের আসনে বসে আছে আবর্তনশীল বড় বড় বস্ন্যাক হোল। যারা তাদের আশপাশ থেকে পদার্থ ছিনতাই করে চলেছে। বস্ন্যাক হোলের নিকটে আসা যেকোনো তারা হয় বস্ন্যাক হোলের মহাকর্ষের প্রভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে অথবা অন্য তারার সাথে সংঘর্ষ ঘটিয়ে তছনছ হয়ে যাবে। ছিন্নভিন্ন পদার্থগুলো সম্ভবত উত্তপ্ত গ্যাসের একটি চাকতি গঠন করবে, যা বস্ন্যাক হোলকে কেন্দ্র করে ঘুরবে ও ক্রমশ ভেতরের দিকে প্রবেশ করবে। যেমনটা হয়েছে সিগনাস এক্স-১ এর ড়্গেত্রে। তবে এখানে চাকতির সাইজটা হবে আরও অনেক বেশি বড়। ১৯৯৪ সালের মে মাসের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, হাবল স্পেস টেলিস্কোপ এম৮৭ গ্যালাক্সির কেন্দ্রে খুব দ্রম্নত ঘূর্ণনশীল গ্যাসের একটি চাকতি দেখতে পেয়েছে। পর্যবেড়্গনের শক্ত ইঙ্গিত হলো ওখানটায় আছে একটি সুপারম্যাসিভ বস্ন্যাক হোল।

সম্ভবত বস্ন্যাক হোলে পতনশীল গ্যাসের চাকতি থেকে নির্গত বিপুল পরিমাণ শক্তি হোলের ঘুর্ণন অড়্গ দিয়ে বেরিয়ে আসে। ফলে প্রায়ই দুই বিপরীত দিকে দুটি ভিন্ন জেট তৈরি হতে দেখা যায়। এই শক্তি নির্গমন ও জেট তৈরির প্রক্রিয়া সম্ভবত খুব জটিল। এতে তড়িচ্চুম্বকত্ব, সান্দ্র ও মহাকর্ষসহ অন্যান্য বল কাজ করে। এই বিষয়টিতে ব্যাপক তাত্ত্বিক ও পর্যবেড়্গণগত গবেষণারর অবকাশ আছে।

মিল্কিওয়ের কী অবস্থা তাহলে? আমাদের ছায়াপথটিও একইভাবে আলোড়িত হতে পারে? মিল্কিওযের কেন্দ্র প্রায় ত্রিশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে আছে। অবস্থান আকাশের ধনু ম্ললীতে (Sagittarius)। এর ভেতরের এলাকাসমূহ বিপুল পরিমাণ গ্যাস ও ধুলো দ্বারা ঢেকে আছে। তাই জ্যোর্তিবিজ্ঞানীরা কাজে লাগিয়েছেন এক্স-রে, গামা রশ্মি ও অবলোহিত আলোর যন্ত্র। এভাবে একটি নিবিড় ঘন ও তেজস্বী বস্তু খুঁজে পাওযা গেল। নাম স্যাজাইটেরিয়াস এ স্টার। ব্যাস কয়েক শ কোটি কিলোমটিরারের বেশি নয় (মহাজাগতিক মাপকাঠিতে ছোটই খুব)। তবুও এটিই ছায়াপথের সবচেয়ে শক্তিশালী বেতার উত্স। একই জায়গায় আবার আছে একটি শক্তিশালী অবলোহিত উত্সও। পাশেই আছে একটি ভিন্নধর্মী এক্সরে বস্তু। পরিস্থিতি খুব জটিল হলেও মনে হচ্ছে এখানে অন্ত্মত একটি ভারী বস্ন্যাক হোল আছে। যেটি পর্যবেড়্গণে পাওয়া কিছু ঘটনার পেছনে দায়ী।

তবে বস্ন্যাক হোলটির ভর সম্ভবত বড় জোর এক কোটি সৌর ভরের সমান। তার মানে, সুপারম্যাসিভ বস্ন্যাক হোলদের মধ্যে অবস্থান একেবারে নীচের দিকে। কিছু কিছু গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে তীব্র শক্তি ও পদার্থ নির্গমনের এমন কোনো প্রমাণ নেই। তবে হতে পারে সেখানকার বস্ন্যাক হোল এখন সুপ্ত অবস্থায় আছে। ভবিষ্যতের কোনো এক সময় যদি এটি আরও বেশি পরিমাণ গ্যাসের সরবরাহ পায়, তাহলে হয়ত জ্তলে উঠবে। অন্যদের মতো এতটা আলোড়ন হয়ত এটি নাও তুলতে পারে। সর্পিল বাহুতে থাকা গ্রহ ও নড়্গত্রের ওপর এই প্রজ্তলনের কী প্রতিক্রিয়া হবে সেটা সষ্ট নয়।

আশেপাশের অঞ্চলের পদার্থ ফুরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত্ম বস্ন্যাক হোল গিলে নেওয়া খাবারের নিশ্চল ভরের শক্তি নির্গত করতে থাকবে। সময়ের সাথে সাথে আরও বেশি বেশি পদার্থ পেটে যাবে বস্ন্যাক হোলের। ফলে বস্ন্যাক হোল ক্রমশ বড় হবে। খিদেও বাড়বে সাথে সাথে। এমনকি বহু দূরের কড়্গপথের নড়্গত্ররাও শেষ পর্যন্ত্ম এর শিকারে পরিণত হবে। এর কারণ মহাকর্ষীয় বিকিরণ। এই প্রতিক্রিয়া খুব দুর্বল হলেও চূড়ান্ত্ম পরিণতি এর ওপরই নির্ভর করে।

১৯১৫ সালে সার্বিক আপেড়্গিকতা দাঁড় করানোর ঠিক পরপরই আইনস্টাইন মহাকর্ষীয় ড়্গেত্রের একটি উলেস্নখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করলেন। তত্ত্বের ড়্গেত্র সমীকরণগুলো বিশেস্নষণ করে তিনি দেখলেন, তরঙ্গের মতো এক ধরনের মহাকর্ষীয় আলোড়নের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। শূন্যস্থানে যেটি আলোর বেড়ে ছড়িয়ে পড়ে। এই মহাকর্ষীয় বিকিরণ মনে করিয়ে দেয় আলো ও বেতার তরঙ্গের মতো তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণের কথা। তবে বিপুল পরিমাণ শক্তি বহন করলেও তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণের সাথে এর পার্থক্য আছে। মহাকর্ষীয় বিকিরণ পদার্থকে আলোড়িত করে তুলনামূলক কম তীব্রতায়। যেখানে তারের জালের মতো নাজুক বস্তুও বেতার তরঙ্গকে শোষণ করে নিতে পারে, সেখানে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ এত দুর্বল প্রতিক্রিয়া করে যে পৃথিবী ভেদ করেও চলে যেতে পারে। এবং বলতে গেলে একটুও তীব্রতা না কমিয়েই। আপনি যদি কোনো মহাকর্ষীয় লেজার বানান, তাহলে এক কিলোওয়াটের একটি বৈদ্যুতিক কু্ললীর সমান কর্মদড়্গতায় এক কেটলি পানি গরম করতে হলে এক লড়্গ কোটি কিলোওয়াট শক্তির রশ্মি লাগবে। প্রকৃতির জানা বলগুলোর মধ্যে মহাকর্ষীয় অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি দুর্বল বলেই এখানেও ঘটছে তার প্রতিফলন। যেমন, একটি পরমাণুর বৈদ্যুতিক শক্তি ও মহাকর্ষীয় শক্তির অনুপাত প্রায় ১০৪০। আমরা যে মহাকর্ষ অনুভব করছি তার একমাত্র কারণ হলো বলটির প্রভাব যোগবোধক। ফলে গ্রহদের মতো বস্তুর ড়্গেত্রে এর ভূমিকাই প্রকট হয়ে ওঠে।

মহাকর্ষ তরঙ্গের প্রতিক্রিয়া যে শুধু অতিমাত্রায় দুর্বল এমন নয়, এর উত্পত্তিও ঘটে নীরবে নীরবে। তত্ত্ব বলছে, এ বিকিরণ উত্পন্ন হয় ভর আলোড়িত হলে। যেমন সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর গতি অবিরত সারি সারি মহাকর্ষীয় তরঙ্গ উত্পন্ন করছে। কিন্তু মোট উত্পন্ন ড়্গমতা মাত্র এক মিলিওয়াট। এই শক্তি হ্রাসের ফলে পৃথিবীর কড়্গপথ একটু একটু করে ছোট হয়ে যাচ্ছে। তবে সেটা হচ্ছে ধীরে। প্রতি দশকে এক সেন্টিমিটারের এক কোটি কোটি ভাগ হারে।

তবে যেসব ভারী বস্তু আলোর খুব কাছাকাছি বেগে চলাচল করে তাদের কথা আলাদা। মহাকর্ষীয় বিকিরণের প্রতিক্রিয়ার পেছনে দুটি বিষয় কাজ করতে পারে। একটি হলো আকস্মিক ও উত্তাল ঘটনা। সুপারনোভা বিস্ফোরণ। যার মাধ্যমে একটি নড়্গত্র গুটিয়ে বস্ন্যাক হোলে পরিণত হয়। এমন ঘটনার ফলে অল্প সময়েল জন্যে মহাকর্ষীয় বিকিরণের সঙ্কেত তৈরি হতে পারে। স্থায়িত্ব হতে পারে মাত্র কয়েক মিলিসেকেন্ড। এবং সাধারণত ১০৪৪ জুল শক্তি নির্গত হতে পারে। (এর সাথে সূর্যের তাপ উত্পাদনের তুলনা করে দেখতে পারেন। সেটা হলো সেকেন্ডে ৩x১০২৬ জুল।

আরেকটি ঘটনা হলো উচ্চ গতির ভারী বস্তুদের একে অপরের চারপাশে প্রদড়্গিণ। যেমন, কাছাকাছি অবস্থানের থাকা দুটি নড়্গত্রের বাইনারি সিস্টেম থেকে অনবরত বিপুল মাত্রায় মহাকর্ষ বিকিরণ নির্গত হবে। এ প্রক্রিয়া ভালো কাজ করবে যদি দুটি প্রদড়্গিণরত নড়্গত্ররা সঙ্কুচিত বস্তু হয়। এই যেমন নিউট্রন নড়্গত্র বা বস্ন্যাক হোল। ঈগল ম্ললীতে (Aquila) দুটি নিউট্রন নড়্গত্র মাত্র কয়েক মিলিয়ন কিলোমিটার দূর থেকে একে অপরকে প্রদড়্গিণ করছে। এদের মহাকর্ষীয় ড়্গেত্র এত শক্তিশালী যে আট ঘণ্টার মধ্যেই একটি ঘূর্ণন সম্পন্ন হয়। ফলে নড়্গত্রগুলো আলোর মোটামুটি কাছের বেগ নিয়েই চলছে। এই দ্রম্নত গতির কারণে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ নির্গমনের হারও বেশি। ফলে প্রতি বছর তাদের কড়্গপথ উলেস্নখযোগ্য হারে (প্রায় ৭৫ মাইক্রোসেকেন্ড) ছোট হচ্ছে। এই হার ক্রমশই বাড়তে থাকবে। এখন থেকে ৩০ কোটি বছর পর তারা একে ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে।

জ্যোতির্বিদদের হিসাব মতে, প্রতি ছায়াপথে প্রায় প্রতি এক লড়্গ বছরে একটি বাইনারি জগত্ এভাবে মিশে যায়। এরা এতটা নিবিড় ও এদের মহাকর্ষীয় ড়্গেত্র এতটা শক্তিশালী যে এরা শেষ মুহুর্তে মিশে যাওয়ার আগের মুহুর্তে প্রতি সেকেন্ডে একে অপরকে হাজার হাজার বার ঘুরে আসবে। মহাকর্ষ তরঙ্গের নির্গমনও হুট করে বেড়ে যাবে। আইনস্টাইনের সূত্র বলছে, এই শেষ অবস্থায় মহাকর্ষীয় শক্তির উত্পাদন হবে অনেক বেশি। কড়্গপথ খুব দ্রম্নত ছোট হয়ে যাবে। পারস্পরিক মহাকর্ষীয় টানের ফলে নড়্গত্রের চেহারা একদম বদলে যাবে। ফলে একে অপরকে স্পর্শ করার সময় তাদেরকে ঘূর্ণায়মান অতিকায় চুরম্নটের মতো দেখাবে। দুটোর একীভবন হবে এক উত্তাল ঘটনা। দুটো নড়্গত্র জোড়া লেগে একটি জটিল ও উন্মত্ত ভরে পরিণত হবে। এ থেকেও নির্গত হবে কাড়ি কাড়ি মহকর্ষ তরঙ্গ। শেষ পর্যন্ত্ম এটি প্রায় গোলকের রূপ ধারণ করবে। একটি বড় ঘণ্টার মতো করে নির্দিষ্ট নকশার কম্পন নিয়ে বাজবে ও আন্দোলিত হবে। এই স্পন্দন থেকেও কিছু মহাকর্ষ বিকিরণ বের হবে। ফলে বস্তুটি আরও কিছু শক্তি হারাবে। আসেত্ম আসেত্ম এটি শান্ত্ম হয়ে আসবে। শেষমেষ নীরব হয়ে যাবে।

শক্তি ড়্গয়ের হার তুলনামূলক ধীর হলেও মহাবিশ্বের কাঠামোর ওপর মহাকর্ষীয় বিকিরণ নির্গমনের বড় দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব কাজ করে। ফলে বিজ্ঞানীদের জন্যে বড় একটি কাজ হলো, পর্যবেড়্গণের মাধ্যমে মহাকর্ষীয় বিকিরণের ধারণাগুলোর সত্যতা যাচাই করা৩। ঈগল ম্ললীর বাইনারি নিউট্রন নড়্গত্র ব্যবস্থা নিয়ে বিশেস্নষণ চালিয়ে দেখা গেছে, কড়্গপথ ছোট হচ্ছে আইনস্টাইনের তত্ত্ব মেনেই। ফলে মহাকর্ষীয় বিকিরণ নির্গমনের সপড়্গে এটি একটি সরাসরি প্রমাণ। তবে আরও নিশ্চিত হতে হলে পৃথিবীর কোনো পরীড়্গাগারে একে শনাক্ত করতে পারতে হবে। মহাকর্ষ তরঙ্গ ধরার জন্যে বহু গবেষনা দল যন্ত্র বানিয়েছেন। তবে আজ পর্যন্ত্ম কোনো যন্ত্রই এ তরঙ্গ ধরার মতো সংবেদনশীল হতে পারেনি। মহাকর্ষীয় বিকিরণের নিশ্চিত প্রমাণ পেতে হলে আমাদেরকে সম্ভবত নতুন প্রজন্মের ডিটেক্টরের জন্যে অপেড়্গা করতে হবে।

দুটো নিউট্রন নড়্গত্রের মিলনে একটি বড় নিউট্রন নড়্গত্র বা বস্ন্যাক হোল তৈরি হতে পারে। একটি নিউট্রন নড়্গত্র ও একটি বস্ন্যাক হোল বা দুটি বস্ন্যাক হোল মিলে অবশ্যই একটি বস্ন্যাক হোল তৈরি করবে। বাইনারি নিউট্রন নড়্গত্রদের মতোই এড়্গেত্রেও কিছু মহাকর্ষীয় তরঙ্গ শক্তি ড়্গয় হবে। সাথে থাকবে বাজনা ও কম্পন। মহাকর্ষ তরঙ্গের ড়্গমতা কমার সাথে সাথে এ প্রক্রিয়াও ধীর হয়ে আসবে।

বস্ন্যাক হোলের মিলন থেকে যে মহাকর্ষীয় শক্তি সংগ্রহ করা যাবে তার তাত্ত্বিক আলোচনা বেশ আকর্ষণীয়। ১৯৭০ এর দশকে এই তাত্ত্বিক বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করেন রজার পেনরোজ, স্টিফেন হকিং, ব্র্যান্ডন কার্টার, রেমো রাফিনি, ল্যারি স্মার প্রমুখ। যদি বস্ন্যাক হোল দুটি অঘূর্ণনশীল ও একই ভরের হয়, তাহলে মোট ভর-শক্তির প্রায় ২৯ শতাংশ সংগ্রহ করা যাবে। আধুনিক প্রযুক্তি বা অন্য কোনো কৌশল কাজে লাগাতে পারলে হয়ত ঐ শক্তিটুকু শুধু মহাকর্ষীয় বিকিরণ হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকবে না। তবে প্রাকৃতিকভাবে বস্ন্যাক হোলের মিলন ঘটে গেলে বেশিরভাগ শক্তিই কিন্তু এই প্রায় অদৃশ্য রূপ ধরেই আসবে। বস্ন্যাক হোলরা যদি পদার্থবিদ্যার আইনে অনুমোদিত সর্বোচ্চ হারে (প্রায় আলোর বেগে) একে অপরের উল্টো দিকে ঘুরে মিলিত হয়, তাহলে ৫০ ভাগ ভর-শক্তি নির্গত হবে।

অবশ্য তাত্ত্বিকভাবে এত বেশি পরমািণটাও সর্বোচ্চ সীমা নয়। বস্ন্যাক হোলের আবার বৈদ্যুতিক চার্জও থাকতে পারে। একটি চার্জিত বস্ন্যাক হোলের বৈদ্যুতিক ড়্গেত্র যেমন থাকে, তেমনি থাকে মহাকর্ষীয় ড়্গেত্র। দুটি ড়্গেত্রে শক্তি ধারণ করতে সড়্গম। ধনাত্মক চার্জধারী একটি বস্ন্যাক হোল ঋণাত্মক চার্জধারী অপর একটি বস্ন্যাক হোলের সাথে মিলিত হলে কিছু শক্তি নির্গত হয়। এই প্রক্রিয়ায় বিদ্যুেচৗম্বকীয় এবং মহাকর্ষীয় দুই রকম শক্তিই বেরিয়ে আসে।

এই নির্গমনের একটি সীমা আছে। কারণ একটি নির্দিষ্ট ভরের একটি বস্ন্যাক হোল কেবল একটি সর্বোচ্চ সীমার বৈদ্যুতিক চার্জ বহন করতে পারে। একটি অঘূর্ণনশীল বস্ন্যাক হোলের জন্যে সেই সীমা নির্ধারিত হয় এভাবে: দুটো অবিকল একই রকম বস্ন্যাক হোলের কথা ভাবুন। এদের চার্জ একই। কৃষ্ণগহ্বরদের মহাকর্ষীয় ড়্গেত্রের ফলে এদের মধ্যে আকর্ষণ কাজ করবে। অন্য দিকে, তড়িত্ বলের কারণে কাজ করবে বিকর্ষণ (সমধর্মী চার্জ বিকর্ষণ করে)। চার্জ ও ভরের অনুপাত একটি সংকট মানে পৌঁছলে এই দুই বিপরীতধর্মী বল একে অপরের সমান হয়ে যায়। ফলে কৃষ্ণগহ্বরদের মধ্যে কোনো নেট বল থাকবে না। একটি কৃষ্ণগহ্বরের সর্বোচ্চ কী পরিমাণ বৈদ্যুতিক চার্জ থাকতে পারবে তা এই শর্তের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়। হয়ত ভাবছেন, কৃষ্ণগহ্বরের চার্জ এর চেয়ে বেশি করার চেষ্টা করলে কী ঘটবে? এটা করার একটি উপায় হলো কৃষ্ণগহ্বরে আরও বেশি চার্জ প্রবেশ করিয়ে দেওয়া। এর মাধ্যমে বৈদ্যুতিক চার্জ বাড়বে। কিন্তু বৈদ্যুতিক বিকর্ষণ ঠেকাতে যে কাজ সম্পন্ন হবে তাতে কিছু শক্তি ব্যয় হবে। এই শক্তিটুকুও কৃষ্ণগহ্বরে প্রবেশ করবে। যেহেতু শক্তিও ভরের আরেক রূপ (E=mc2 সূত্রটি মনে করে দেখুন), ফলে কৃষ্ণহ্বর ভারী ও বড় হয়ে যাবে। সহজেই হিসাব করে দেখানো যায়, এই প্রক্রিয়ায় ভর চার্জের চেয়ে বেশি বাড়ে। ফলে চার্জ ও ভরের অনুপাত আসলে কমে যায়। আর এই সীমা অতিক্রম করার প্রচেষ্টাও হয় ব্যর্থ।

একটি চার্জিত কৃষ্ণগহ্বরের বৈদ্যুতিক ড়্গেত্র এর মোট ভরের কিছু অংশের যোগান দেয়। সম্ভাব্য সর্বোচ্চ চার্জ ধারণকারী কৃষ্ণগহ্বরের ড়্গেত্রে বৈদ্যুতিক ড়্গেত্র থেকে আসে অর্ধেক ভর। যদি দুটি আবর্তনহীন কৃষ্ণগহ্বরের মধ্যে বিপরীত চিহ্নের সর্বোচ্চ চার্জ থাকে, তাহলে তারা একে অপরকে মহাকর্ষীয় বল দ্বারা আকর্ষণ করবে, আবার বৈদ্যুতিক বল দ্বারাও আকর্ষণ করবে। তারা মিলিত হয়ে গেলে বেদ্যুতিক চার্জ প্রশমিত হয়ে যাবে। বৈদ্যুতিক চার্জ বের করেও নেওয়া যাবে। তাত্ত্বিকভাবে এটা ঐ সিস্টেমের মোট ভরের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত্ম হতে পারে।

শক্তি সংগ্রহের পরম সর্বোচ্চ সীমা অর্জন করা সম্ভব হবে যদি দুটি বস্ন্যাক হোলই আবর্তন করতে থাকে আর যদি তাদের বৈদ্যুতিক চার্জ হয় বিপরীতধর্মী। তাহলে মোট ভর-শক্তির দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত্ম নির্গত হবে। এটা ঠিক যে এই মানগুলোর গুরম্নত্ব আছে শুধু তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেই। কারণ বাসত্মব একটি বস্ন্যাক হোলের অনেক বেশি বৈদ্যুতিক চার্জ থাকার সম্ভাবনা খুব কম। তাছাড়া দুটি বস্ন্যাক হোল যে আদর্শ উপায়েই মিলিত হবে সে সম্ভাবনাও কম। যদি না কোনো উন্নত প্রযুক্তির অধিকারী জাতি সেটা ঘটাতে সড়্গম হয়। তবে দুটি বস্ন্যাক হোল যদি খুব বেশি আদর্শ উপায়ে মিলিত নাও হয় তবুও সম্ভবত প্রায় তাত্ড়্গণিকভাবে শক্তি নির্গত হবে। দুটি বস্তুর মিলিত ভর-শক্তির উলেস্নখযোগ্য একটি অংশ শক্তিই এভাবে নির্গত হবে। এটাকে বহু বছর ধরে চলতে থাকা নড়্গত্রের নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়ার সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যার মাধ্যমে নড়্গত্র মাত্র এক শতাংশ শক্তি নির্গত করে।

এই মহাকর্ষীয় ঘটনা একটি দিক থেকে খুবই গুরম্নত্বপূর্ণ। ফিউশন বিক্রিয়ার জ্তালানি শেষ হয়ে গেলেই যে একটি নড়্গত্র একেবারে মারা যায় তা কিন্ত্ম নয়। একটি সংকুচিত অঙ্গারে পরিণত হবার পর একটি উজ্জ্বল গ্যাসীয় গোলক আকারে নড়্গত্রটি ফিউশন বিক্রিয়ার চেয়েও অনেক বেশি পরিমাণ শক্তি নির্গত করার ড়্গমতা রাখে। এ বিষয়টি ভালো করে বোঝা গেছে প্রায় বিশ বছর আগে। এ ধারণা কাজে লাগিয়ে পদার্থবিদ ও বস্ন্যাক *হোল* শব্দের জনক জন হুইলার একটি সভ্যতার কথা কল্পনা করেছেন, যারা তাদের উত্তরোত্তর শক্তির চাহিদার কথা বিবেচনা করে নিজেদের নড়্গত্রের জগত্ থেকে বেরিয়ে এসে একটি ঘূর্ণনশীল বস্ন্যাক হোলের পাশে বাড়ি বানিয়েছে। প্রতিদিন তারা তাদের বর্জ্যগুলো ট্রাকে ভর্তি করে খুব হিসেব করে বানানো পথে বস্ন্যাক হোলের দিকে পাঠিয়ে দেয়। বস্ন্যাক হোলের কাছে এসে ট্রাকের পদার্থগুলো ঢেলে দেওয়া হয়। এভাবে চিরকালের জন্যে বর্জ্যগুলোর সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হয়।

পতনশীল বস্তুগুলো বস্ন্যাক হোলের দিকে এগিয়ে যাবার সময় হোলের উল্টো দিকে আবর্তন করে। ফলে বস্ন্যাক হোলের ঘূর্ণন কিঞ্চিত বাধাগ্রস্থ হয়। ফলে বস্ন্যাক হোলের এই ঘূর্ণনশক্তিটুকু বেরিয়ে আসে। ফলে উন্নত সভ্যতার মানুষেরা তাদের শিল্প-কারখানায় সেই শক্তি ব্যবহার করতে পারে।৪ ফলে এই পদ্ধতির দুটো লাভ। সবগুলো বর্জ্য চিরতরে বিদায় হলো। কিন্তু বিদায় হবার সময় দিয়ে গেল মূল্যবান অনেকখানি শক্তি। এভাবে ঐ সভ্যতার মানুষেরা প্রয়োজনের আলোকে একটি মৃত নড়্গত্র থেকে বিপুল পরিমাণ শক্তি সঞ্চয় করতে পারেন। যতটা শক্তি নড়্গত্রটি তার পুরো আলোকোজ্জ্বোল৫ জীবনেও নির্গত করেনি।

এটা ঠিক যে বস্ন্যাক হোল থেকে শক্তি সঞ্চয়ের বিষয়টাকে বিজ্ঞান কল্পগল্প মনে হচ্ছে। তবে প্রাকৃতিকভাবেই প্রচুর পরিমাণ পদার্থের অনিবার্য ঠিকানা কিন্ত্ম বস্ন্যাক হোল। সেটা হতে পারে দুইভাবে। হয় পদার্থগুলো এমন এক নড়্গত্রের উপাদান যেটি সংকুচিত হয়ে বস্ন্যাক হোলে পরিণত হতে যাচ্ছে। অথবা পদার্থগুলো কোনোভাবে বস্ন্যাক হোলের খাবারে পরিণত হবে। বস্ন্যাক হোল নিয়ে লেকচার দিতে গেলেই মানুষ আমাকে জিজ্ঞেস করে, কোনো কিছু বস্ন্যাক হোলে চলে গেলে তার কী ঘটে? অল্প কথায় উত্তর হলো, আমরা জানি না। বলা চলে, বস্ন্যাক হোল সম্পর্কে আমাদের জানার একমাত্র উপায় তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও গাণিতিক মডেলিং। একটু আগে যেটা বললাম এটাও।

বস্ন্যাক হোলের সংজ্ঞা অনুসারেই কিন্তু আমরা বাইরে থেকে এর ভেতরের কিছু দেখতে পাই না। অতএব, আমাদের বস্ন্যাক হোল পর্যন্ত্ম পর্যবেড়্গণের সুযোগ থাকলেও (যেটা আসলে আমাদের নেই) এর ভেতরটায় কী চলছে সেটা আমরা কখনও জানব না। তবে এড়্গেত্রে আপেড়্গিকতা তত্ত্ব আমাদেরকে আশার আলো দেখায়। বস্ন্যাক হোলের অসিত্মত্ত্বের কথাও জানিয়েছিল এই তত্ত্বটিই। কোনো নভোচারী বস্ন্যাক হোলের ভেতরে চলে কী ঘটবে তত্ত্বটির মাধ্যমে আমরা সেটা অনুমান করতে পারি। এখন আমরা এই তাত্ত্বিক ফলাফলগুলোর সারমর্মই দেখব।

বস্ন্যাক হোলের পৃষ্ঠ আসলে নিছকই একটি গাণিতিক কাঠামো। সত্যিকার কোনো পৃষ্ঠের কিন্তু কোনো অসিত্মত্ত্ব নেই। আছে শুধুই ফাঁকা স্থান। পতনশীল নভোচারী ভেতরে প্রবেশের সময় বিশেষ কিছুই দেখবেন না। তারপরেও পৃষ্টের কিন্তু একটি নির্দিষ্ট ও কিছুটা চমকপ্রদ ভৌত (physical) তাত্পর্য আছে। হোলের ভেতরে মহাকর্ষ এত শক্তিশালী যে আলোই আটকে আছে। বের হতে ইচ্ছুক আলোর ফোটন কণা পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়। তার মানে, বস্ন্যাক হোল থেকে আলো বেরিয়ে আসতে পারে না। আর এ কারণেই বাইরে থেকে বস্ন্যাক হোলকে দেখা যায় না। আর কোনো বস্তু বা তথ্য আলোর চেয়ে জোরে ছুটতে পারে না বলে একবার এর সীমানায় প্রবেশ করে ফেললে কোনো কিছুই আর সেখান থেকে বের হতে পারে না। যে সমসত্ম ঘটনা বস্ন্যাক হোলের অভ্যন্ত্মরে ঘটবে, তা চিরকালই বাইরের দর্শকের দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যাবে। এ কারণে বস্ন্যাক হোলের পৃষ্ঠকে৬ বলা হয় ঘটনা দিগন্ত্ম (event horizon)। কারণ এই দিগন্ত্ম বস্ন্যাক হোলের ভেতরে ও বাইরে ঘটা ঘটনাকে আলাদা করে দেয়। দিগন্ত্মের ভেতরের ঘটনা আমরা দেখি না। দেখি বাইরের ঘটনা। তবে দৃষ্টির আড়াল হবার বিষয়টি কিন্তু একমুখী। বস্ন্যাক হোলের ভেতরের নভোচারীকে আমরা না দেখলেও নভোচারী কিন্তু ভেতর থেকে বাইরের মহাবিশ্ব পাবেন।

নভোচারী যতই ভেতরে যাবেন, মহাকর্ষের থাবা ততই বাড়বে। এর একটি প্রভাব হলো শারীরিক বিকৃতি। নভোচারীর পা প্রথমে বস্ন্যাক হোলে প্রবেশ করলে মাথার চেয়ে পা এর কেন্দ্র বেশি কাছে থাকবে। ফলে মহাকর্ষের শক্তি পায়ে বেশি অনুভূত হবে। ফলে, পায়ে নীচের দিকে তীব্র টান অনুভূত হবে। ফলে নভোচারীর শরীর দৈর্ঘ্য বরাবর প্রসারিত হয়ে যাবে। একই সাথে এবং একই দিকে কিন্ত্ম নভোচারীর ঘাড়েও টান পড়বে। ফলে ভদ্রলোক চিকনও হয়ে যাবেন। এই যে লম্বা ও চিকন হয়ে যাবার প্রক্রিয়া, একে অনেক সময় বলা হয় স্ফ্যাঘেটিফিকেশন বা সেমাই প্রভাব (spaghettification)।

তত্ত্ব বলছে, বস্ন্যাক হোলের কেন্দ্রে মহাকর্ষ হয়ে যায় সীমাহীন। আর মহাকর্ষের বহিঃপ্রকাশ তো ঘটে স্থান-কালের বক্রতার মাধ্যমে। ফলে মহাকর্ষ শক্তিশালী হবার সাথে সাথে স্থান-কালের বক্রতাও হয়ে যায় সীমাহীন। গণিতের ভাষায় এ অবস্থার নাম স্পেসটাইম সিঙ্গুলারিটি। এটা হলো স্থান-কালের এমন একটি সীমানা বা প্রান্ত্ম যাতে স্থান-কালের সাধারণ ধারণার কোনো স্থান নেই। বহু পদার্থবিদের বিশ্বাস, বস্ন্যাক হোলের ভেতরের সিঙ্গুলারিটি সত্যিকার অর্থেই স্থান-কালের কবর রচনা করে। কোনো বস্তু এখানে পৌঁছে গেলে ধ্বংস অনিবার্য। আসলেই যদি সেটা হয়, তাহলে নভোচারীর শরীর চলে যাবে সিঙ্গুলারিটিতে। তীব্র সেমাই প্রভাবের এই কাজটিতে সময় লাগবে মাত্র এক ন্যানোসেকেন্ড৭।

আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথে থাকা সম্ভাব্য বস্ন্যাক হোলের ভর এক কোটি সৌরভরের সমান। এমন ভরের ও অঘূর্ণনশীল কোনো বস্ন্যাক হোলের ড়্গেত্রে ঘটনা দিগন্ত্ম থেকে সিঙ্গুলারিটিতে গিয়ে পটল তুলতে সময় লাগবে প্রায় তিন মিনিট। এই শেষ তিনি মিনিট (লাস্ট থ্রি মিনিটস) মোটেও আরামদায়ক হবে না। বাসত্মবে আসলে সিঙ্গুলারিটিতে যাবার বহু আগেই সেমাই প্রভাবের কারণে বেচারা মারা পড়বেন। এই শেষ সময়ে নভোচারী মহাশয় কোনোভাবেই প্রাণঘাতী সিঙ্গুলারিটিকে চোখে দেখতে পারবে না। কারণ এই বিন্দুটি থেকে কোনো আলো আসতে পারে না। বস্ন্যাক হোলটির ভর যদি মাত্র এক সৌরভরের সমান হয়, তাহলে এর ব্যাসার্ধ হবে প্রায় তিন কিলোমিটার। এড়্গেত্রে ঘটনা দিগন্ত্ম থেকে সিঙ্গুলারিটিতে পৌঁছতে সময় লাগবে মাত্র কয়েক মাইক্রোসেকেন্ড৮।

পতনশীল নভোচারীর প্রসংগ কাঠামো থেকে ধ্বংস হতে সময় লাগে খুব কম সময়। তবে বস্ন্যাক হোলের সময়ের বিকৃতিটা এমনভাবে ঘটে যে দূর থেকে দেখলে নভোচারীর শেষের দিকের ভ্রমণকে খুব ধীরে চলছে বলে মনে হবে। নভোচারী ঘটনা দিগন্ত্মের যত কাছে যাবেন, দূরের দর্শকের কাছে নভোচারীর আশেপাশের ঘটনাগুলো তত বেশি ধীরে চলছে বলে মনে হতে থাকবে। এবং আসলে মনে হবে নভোচারীকে ঘটনা দিগন্ত্মে পৌঁছতে অসীম পরিমাণ সময় লাগছে। ফলে বাইরের দুনিয়ায় যেটাকে অসীম সময় মনে হচ্ছে, নভোচারী সেটার শিকার হচ্ছেন মুহূর্তের মধ্যেই। এই দিক থেকে ভাবলে বস্ন্যাক হোল আসলে মহাবিশ্বের শেষ প্রান্ত্মের একটি দরজা। একটি মহাজাগতিক অন্ধগলি। বের হবার এমন এক পথ যে পথ নিয়ে যাবে না কোনো ঠিকানায়। বস্ন্যাক হোল স্থানের খুব ছোট্ট একটি অঞ্চল। সময়ের ইতি যেখানে। যারা মহাবিশ্বের পরিণতি সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক, একটি বস্ন্যাক হোলে ঝাঁপ দিয়ে সেটা তারা নিজেরাই জেনে নিতে পারবেন।

এটা ঠিক যে মহাকর্ষই প্রকৃতির সবচেয়ে দুর্বল বল। কিন্তু এর তীড়্গভেদী ও সম্মিলিত ক্রিয়ার ওপরই নির্ভর করছে ভবিষ্যত্। বিচ্ছিন্ন মহাজাগতিক বস্তু কিংবা সমগ্র মহাবিশ্ব দুটোর জন্যেই এই কথা প্রযোজ্য। যে তীব্র মহাকর্ষীয় আকর্ষণ একটি নড়্গত্রে গুটিয়ে ফেলে, সেই একই মহাকর্ষ কাজ করে সার্বিকভাবে মহাবিশ্বের আরও বড় স্কেলেও। এই আকর্ষণের ফল খুব সূক্ষ্মভাবে নির্ভর করে আকর্ষণ সৃষ্টির জন্যে উপস্থিত বস্তুর পরিমাণের ওপর। সেটা জানতে হলে আমাদেরকে মহাবিশ্বের ওজন পরিমাপ করতে হবে।

অনুবাদকের নোট:

1. বাসত্মবে করা অসম্ভব বা কঠিন এমন ড়্গেত্রে বিশেষত কম্পিউটারে সাহায্যে বিষয়টি নিয়ে কাজ করার নাম সিমুলেশন। যেমন, কম্পিউটার প্রোগ্রামে বস্ন্যাক হোলের নমুনা বানানো। কোনো তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয় করার জন্যে অনেক সময় কম্পিউটার সিমুলেশন করে ডেটা তৈরি করা হয়। গণিত ও পরিসংখ্যানের এর ব্যবহার খুব বেশি। তবে কম্পিউটার ছাড়াও সিমুলেশন হয়। যেমন ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় সৈন্যদের অনুশীলন করানোর জন্যে কাঠের নকল ঘোড়ার প্রচলন ছিল। আজকাল বাসায় দৌড়ানোর জন্যে ট্রেডমিল খুব জনপ্রিয়। নকল দৌড়ের এ পদ্ধতিও কিন্তু এক ধরনের সিমুলেশন।
2. প্রবাহীর (তরল বা গ্যাস) বিভিন্ন সত্মরের মধ্যে ঘর্ষণের ফলে উদ্ভূত বল।
3. ২০১৫ সালে মহাকর্ষ তরঙ্গ প্রথম সরাসরি পর্যবেড়্গণ করা সম্ভব হয়। নিশ্চিত হয়ে ঘোষণা দেওয়া হয় ২০১৬ সালে। ২০১৭ সালে এ বিষয়ে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কিপ থর্নসহ তিনজন বিজ্ঞানী।
4. এটার সাথে মিল আছে বাসত্মবে প্রয়োগ করা একটি কৌশলের। নাম গ্র্যাভিটেশনাল সিস্নংশট। পৃথিবী থেকে দূর মহাকাশে যান প্রেরণের সময় একে এক বা একাধিক গ্রহের কড়্গপথের খুব কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আগে থেকে থাকা নিজস্ব বেগের কারণে গ্রহটির মহাকর্ষ মহাকাশযানকে পুরোপুরি আটকে ফেলতে পারে না। মহাকাশযান পরে আবার সংশিস্নষ্ট বস্তুর মহাকর্ষ ড়্গেত্র থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু সাথে নিয়ে আসে বস্তুটির মহাকর্ষীয় শক্তির একটা অংশ। এভাবে নিজের ড়্গমতা বাড়িয়ে নেয় যান। তবে সংশিস্নষ্ট গ্রহের শক্তি ড়্গয় হয় খুব নগণ্য পরিমাণ।
5. অর্থাত্, নড়্গত্রটি যখন ফিউশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে আলো দিত।
6. মনে রাখতে হবে, এই পৃষ্ঠ কিন্তু নিছক গাণিতিক একটা সীমা। বাসত্মব কোনো পৃষ্ঠ নয়।
7. এক ন্যানোসেকেন্ড হলো এক সেকেন্ডের একশ কোটি ভাগের এক ভাগ।
8. এক মাইক্রোসেকেন্ড হলো এক সেকেন্ডের ১০ লড়্গ ভাগের এক ভাগ।

দ্য লাস্ট থ্রি মিনিটস

ষষ্ঠ অধ্যায়

মহাবিশ্বের ওজন পরিমাপ (Weighing The Universe)

প্রায়ই বলা হয়, ওপরে যে যায়, তাকে নীচে নামতেই হবে। আকাশের দিকে ছুঁড়ে মারা কোনো বস্তু মহাকর্ষের টানে আটকা পড়ে। বাধ্য হয় নীচে নেমে আসতে। কিন্তু সব সময় তা হয় না। যথেষ্ট জোরে চললে বস্তুটির পক্ষে পৃথিবীর মহাকর্ষ থেকে চিরতরে মুক্তি পেয়ে মহাশূন্যে চলে যাওয়া সম্ভব। ফিরে আসতে হবে না আর কখনও। যেসব রকেটের সাহায্যে বিভিন্ন গ্রহে যান পাঠানো হয় সেগুলো এই বেগ (মুক্তি বেগ) অর্জন করে।

এই মুক্তিবেগের মান সেকেন্ডে প্রায় ১১ কিলোমিটার। ঘণ্টায় ২৫ হাজার মাইল। এই বেগ কনকর্ড বিমানের বিশ গুণেরও বেশি। দি সঙ্কট মান পৃথিবীর ভর (এতে যতটুকু পদার্থ আছে) ও ব্যাসার্ধ দুটোর ওপরই নির্ভর করছে। একটি নির্দিষ্ট ভরের বস্তু যত ছোট হবে, এর পৃষ্ঠে মহাকর্ষ তত বেশি শক্তিশালী হবে। সৌরজগৎ থেকে বের হতে পারার অর্থ হলো সূর্যের মহাকর্ষকে জয় করা। এক্ষেত্রে মুক্তি বেগের মান সেকেন্ডে ৬১৮ কিলোমিটার। আমাদের মিল্কিওয়ে বা আকাশগঙ্গা ছায়াপথ থেকে বের হতেও সেকেন্ডে কয়েকশ কিলোমিটার বেগ লাগবে। অন্য দিকে, একটি নিউট্রন নক্ষত্রের মতো ঘন বস্তু থেকে বের হয়ে যেতে সেকেন্ডে কয়েক অযুত কিলোমিটার বেগ প্রয়োজন। আর ব্ল্যাক হোল থেকে বের হতে তো লাগবে আলোর চেয়ে বেশি বেগ (সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার)।

আর মহাবিশ্ব থেকে বের হতে চাইলে? ২য় অধ্যায়ে আমি বলেছি, মহাবিশ্বের কোনো প্রান্ত আছে বলে মনে হয় না। ফলে, বের হবার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু আমরা যদি ধরে নেই প্রান্ত আছে এবং আরও ধরা যাক, এই প্রান্ত হলো আমাদের দৃষ্টিসীমার শেষ বিন্দুতে (প্রায় দেড় হাজার আলোকবর্ষ দূরে), তাহলে মুক্তি বেগ হবে প্রায় আলোর বেগে সমান। এই ফলাফল খুব তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, দেখে মনে হচ্ছে, সবেচেয়ে দূরের ছায়াপথরা আমাদের থেকে প্রায় আলোর বেগে দূরে সরে যাচ্ছে। দেখে তো মনে হয়, ছায়াপথরা এত দূরে সরছে যে তারা হয়ত মহাবিশ্ব থেকে বেরই হয়ে যাবে। সেটা না হলেও একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন যেন হবেই। ফিরে আসবে না কখনো।

আসলে দেখা যাচ্ছে যে প্রসারণশীল মহাবিশ্ব আসলে অনেকটাই পৃথিবী থেকে নিক্ষিপ্ত বস্তুর মতোই আচরণ করছে। যদিও মহাবিশ্বের সুনির্দিষ্ট কোনো প্রান্ত নেই। প্রসারণের গতি খুব বেশি হলে সরতে থাকা ছায়াপথগুলো মহাবিশ্বের সব পদার্থের সম্মিলিত মহাকর্ষীয় বন্ধন থেকে আলাদা হয়ে যাবে। আর এতে করে প্রসারণ চলবে চিরকাল। অন্য দিকে, প্রসারণ ধীর হলে এক সময় মহাবিশ্বের প্রসারণ থেমে যাব। মহাবিশ্ব সংকুচিত হতে শুরু করবে। ছায়াপথরা তখ আবার ‘নীচের দিকে’ নামতে শুরু করবে। শেষ পর্যন্ত ঘটবে চূড়ান্ত মহাজাগতিক বিপর্যয়। পতন হবে মহাবিশ্বের।

এর মধ্যে কোনটি ঘটবে? দুটি সংখ্যার তুলনার মধ্যে এর উত্তরটি নির্ভর করছে। একটি হলো প্রসারণের গতি। আরেকটি হলো মহাবিশ্বের মোট মহাকর্ষীয় টান, যাকে আসলে মহাবিশ্বের ওজন বলা চলে। মহাকর্ষীয় টান যত বেশি হবে, সে টানকে অগ্রাহ্য করতে হলে মহাবিশ্বকে তত বেশি দ্রুত প্রসারিত হতে হবে। জ্যোতির্বিদরা লোহিত সরণ প্রভাব১ পর্যবেক্ষণ করে সরাসরি প্রসারণ হার বের করতে পারেন। কিন্তু মহাবিশ্বের ভাগ্য কী ঘটবে সে প্রশ্নের সমাধান হয়নি। দ্বিতীয় রাশিটি, মানে মহাবিশ্বের ওজন নিয়ে সমস্যাটা এখনও রয়ে গেছে।

মহাবিশ্বের ওজন কীভাবে জানা সম্ভব? কাজটাকে সথেষ্ট কঠিন মনে হতে পারে। বোঝাই যাচ্ছে, এটা সরাসরি করার কোনো উপায় নেই। কিন্তু মহাকর্ষ তত্ত্ব কাজে লাগিয়ে আমরা এর ওজন সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি। ওজনের একটি নিম্নসীমা সহজেই পাওয়া যায়। গ্রহদের ওপর সূর্যের মহাকর্ষীয় টান পরিমাপ করে সূর্যের ওজন (ভর) জানা যায়। আমরা জানি, আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে প্রায় একশ বিলিয়ন (দশ হাজার কোটি) নক্ষত্র আছে। এদের গড় ভর আমাদের সূর্যের ভরের সমান। ফলে এর মাধ্যমে আমরা আমাদের গ্যালাক্সির ন্যূনতম ভরের একটি প্রাথমিক হিসাব পাই। এবার আমাদেরকে দেখতে হবে মহাবিশ্বে কতগুলো গ্যালাক্সি আছে। এরা সংখ্যায় এত বেশি যে এদেরকে এক এক করে গোণা যাবে না। তবে অনুমাননির্ভর বেশ ভালো একটি হিসাব হলো দশ বিলিয়ন (এক হাজার কোটি)। তাহলে সব মিলিয়ে দাঁড়ায় ১০২১ সৌর ভর। অন্য কথায় ১০৪৮ টন। এই গ্যালাক্সিগুলোর সমাবেশের ব্যাসার্ধ পনের বিলিয়ন আলকবর্ষ ধরে নিলে মহাবিশ্বের মুক্তিবেগের ন্যূনতম একটি মান পাওয়া যাবে। এই মানটি দাঁড়ায় আলোর বেগের এক শতাংশ। আমরা যদি ধরে নেই যে মহাবিশ্বের ভর শুধু নক্ষত্রের ভর হিসাব করেই পাওয়া যাবে, তাহলে মহাবিশ্ব নিজের মহাকর্ষীয় টানকে অগ্রাহ্য করে চিরকাল প্রসারিত হতে থাকবে।২

অনেক বিজ্ঞানীরই বিশ্বাস, মহাবিশ্বের ভাগ্যে ঠিক এটাই ঘটবে। তবে কিছু কিছু জ্যোতির্বিদ ও কসমোলজিস্ট বলছেন ভরের সমষ্টি হয়ত সঠিকভাবে হিসাব করা হয়নি। আমরা যেসব বস্তু দেখতে পাচ্ছি বাস্তবে বস্তু আছে তার চেয়ে বেশি। মহাবিশ্বের সব বস্তু তো আর উজ্জ্বল নয়। নক্ষত্র, গ্রহ৩ ও ব্ল্যাক হোলদের মতো অনুজ্জ্বল বস্তুরা আমাদের দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যায়। এছাড়াও রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ধুলি ও গ্যাস। যাদের বেশিরভাগই সহজে চোখে পড়ে না। আরও কথা আছে। গ্যালাক্সির মাঝখানের স্থানও কিন্তু একেবারেই ফাঁকা নয়। পদার্থ আছে এখানটায়ও। খুব সম্ভব এখানে আছে বিপুল পরিমাণ হালকা গ্যাস।

তবে আরেকটি চমকপ্রদ সম্ভাবনাও কয়েক বছর ধরে জ্যোতির্বিদদের নজর কেড়ে রেখেছে। যে বিগ বিং এর মাধ্যমে মহাবিশ্বের সূচনা, সেই বিস্ফোরণটিই আমাদের দেখা সব বস্তুর উৎস। কিন্তু আমরা দেখি না এমন কিছু বস্তুরও উৎস সেই বিস্ফোরণ। মহাবিশ্ব যদি অতিপারমাণবিক কণার এক উত্তপ্ত আধার হিসেবেই শুরু হয়ে থাকে, তবে সাধারণ বস্তুর উপাদান আমাদের পরিচিত ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন ছাড়া অন্যসব কণাও বিপুল পরিমাণ তৈরি হয়ে থাকবে। কণাপদার্থবিদরা সম্প্রতি পরীক্ষাগারে এই কণাগুলো শনাক্ত করেছেন। এই কণাগুলো খুবই অস্থিতিশীল। ফলে এরা খুব দ্রুতই ক্ষয় হয়ে যাবার কথা। তবে এদের কিছু কিছু হয়ত আজও অবশিষ্ট আছে। মহাবিশ্বের সূচনার ধ্বংসাবশেষ হিসেবে।

এই ধ্বংসাবশেষগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো নিউট্রিনো। সেই ভূতুড়ে কণাগুলো, যাদের সুপারনোভায় খুব সক্রিয় (দেখুন চতুর্থ অধ্যায়)। আমরা যতটুকু জানি, তাতে নিউট্রিনোরা ক্ষয় হয়ে অন্য কিছুতে পরিণত হতে পারে না। (আসলে নিউট্রিনো আছে তিন রকমের। এক ধরনে নিউট্রিনো অন্য নিউট্রিনোতে রূপান্তরিত হতে পারে। এই দিকটা আপাতত আমরা বিবেচনা থেকে বাদ দিচ্ছি) ফলে বিগ ব্যাং এর ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া মহাজাগতিক নিউট্রিনো দিয়ে মহাবিশ্ব পরিপূর্ণ থাকার কথা। আদিম মহাবিশ্বে সব ধরনের অতিপারমাণবিক কণা সমানভাবে তৈরি হয়েছিল ধরে নিলে হিসেব করে জানা সম্ভব কতগুলো মহাজাগতিক নিউট্রিনো থাকা উচিৎ। হিসেব করে দেখা গেল প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে নিউট্রিনোর পরিমাণ হওয়া উচিৎ ১০ লক্ষ। অন্য কথায়, সাহদারণ বস্তুর প্রতিটি কণার বিপরীতে নিউট্রিনোর সংখ্যা হওয়া উচিত প্রায় একশ কোটি।

দারুণ এই ফলাফলটি আমাকে সবসময় মুগ্ধ করেছে। প্রতি মুহূর্তে আপনার দেহের মধ্যে একশ বিলিয়ন নিউট্রিনো উপস্থিত আছে। যার প্রায় সবই বিগ ব্যাং এর ধ্বংসাবশেষ। অস্তিত্বের একদম শুরু থেকে এরা এখনও মোটামুটি একই অবস্থায় আছে। নিউট্রিনোরা আলোর সমান বা কাছাকাছি গতিতে চলে। এ কারণে এরা মুহুর্তের মধ্যে আপনার শরীরের ভেতর দিয়ে চলে যায়। প্রতি সেকেন্ডে একশ বিলিয়ন নিউট্রিনো এই কাজ করে। এই অবিরাম চলাচল আমরা খেয়াল করি না কারণ নিউট্রিনোরা সাধারণ বস্তুর সাথে খুব দুর্বলভাবে ক্রিয়া করে। ফলে কোনো একটি আপনার দেহের মধ্যে আটকে যাবে সেই সম্ভাবনা খুব সামান্য। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে শূন্যস্থানে এত নিউট্রিনোর উপস্থিতি মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতিতে বড় প্রভাব রাখতে পারে।

নিউট্রিনোরা খুব দুর্বলভাবে ক্রিয়া করলেও অন্য সব কণার সাথে তাদের মহাকর্ষীয় বল কিন্তু কাজ করে। তারা হয়ত আশেপাশের অন্য কণাকে খুব বেশি ঠেলা-ধাক্কা দিতে পারে না, কিন্তু তাদের পরোক্ষ মহাকর্ষীয় প্রতিক্রিয়া মহাবিশ্বের ওজন মাপতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাদের ভূমিকা কতটুকু সেটা জানতে হলে জানতে হবে তাদের ভর।

মহাকর্ষ নিয়ে হিসাব করতে গেলে দরকার হয় প্রকৃত ভর, নিশ্চল ভর নয়। নিউট্রিনোদের নিশ্চল ভর যদি কমও হয়, আলোর কাছাকাছি বেগে চলার কারণে এদের ভর কিন্তু উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠবে (দেখুন ৩৯ পৃষ্ঠা)। আবার এদের ভর শূন্যও হতে পারে। সেক্ষেত্রে এরা চলবে আলোর বেগে। তাহলে তাদের শক্তির সাথে তুলনা করে প্রকৃত ভর জানা যাবে। আর মহাজাগতিক ধ্বংসাবশেষ হিসেবে পাওয়া নিউট্রিনোর ক্ষেত্রে এই শক্তির হিসাব পাওয়া যাবে বিগ ব্যাং থেকে পাওয়া শক্তির অনুমিত পরিমাণ থেকে। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে শক্তি একটু দুর্বল হচ্ছে। এ কারণে মূল শক্তির পরিমাণকে সংশোধন করে নিতে হবে। তবে এই সংশোধন করে নেওয়ার পরেও দেখা যাচ্ছে, শূন্য নিশ্চল ভরের নিউট্রিনোরা মহাবিশ্বের মোট ওজনে তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না।

অন্য দিকে, আমরা নিউট্রিনোর নিশ্চল ভর শূন্য কি না এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত নই। আবার সব ধরনের নিউট্রিনোর নিশ্চল ভর সমান কি না সেটাও জানা নেই আমাদের। নিউট্রিনো সম্পর্কে বর্তমানে আমরা যা জানি তাতে এদের সসীম একটি নিশ্চল ভর থাকা অসম্ভব নয়। অতএব, পরীক্ষা চালিয়ে দেখতে হবে আসল কোনটি সঠিক। চতুর্থ অধ্যায়েও আমরা বলেছি, নিউট্রিনোর ভর থাকলেও সেটা অবশ্যই খুব সামান্য হবে। ভর হবে পরিচিত অন্য যে কোনো কণার চেয়ে কম। কিন্তু মহাবিশ্বে নিউট্রিনোর সংখ্যা অনেক বেশি হবার কারণে খুব সামান্য নিশ্চল ভরও মহাবিশ্বের মোট ওজনে বড় ভূমিকা রাখবে। বিষয়টি খুব সূক্ষ্মভাবে ভারসাম্য মেনে চলে। ইলেকট্রনের (পরিচিত কণিকাদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা) ভরের ১০ হাজার ভাগের মাত্র এক ভাগ পরিমাণ ভরও বড় প্রভাব রাখতে সক্ষম।৪ সেক্ষেত্রে নিউট্রিনোদের ভর হবে নক্ষত্রের ভরকেও ছাড়িয়ে যাবে।

এত ছোট নিশ্চল ভর শনাক্ত করা খুব কঠিন কাজ। এ বিষয়ক বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফলগুলোও ছিল বিভ্রান্তিকর ও পরস্পরবিরোধী। তবে একটি বিষয় খুব কৌতূহলের জন্ম দেয়। ১৯৮৭এ সুপারনোভা থেকে পাওয়া গেছে গুরুত্বপূর্ণ একটি সূত্র। আগেই বলেছি, নিউট্রিনোর নিশ্চল ভর শূন্য হলে তারা অবশ্যই সবাই আলোর সমান গতিতে চলাচল করবে। সবার গতিই কিন্তু সমান হবে এক্ষেত্রে। কিন্তু এদের যদি অল্প হলেও কিছু নিশ্চল ভর থাকে, তাহলে ভর নানান রকম হতে পারে। সুপারনোভা থেকে বের হওয়া নিউট্রিনোরা হবে খুব তেজস্বী। তাই এদের নিশ্চল ভর কিছুটা থাকলেও এরা চলবে আলোর খুব কাছাকাছি গতিতে। কিন্তু পৃথিবীতে এসে পৌঁছানোর আগে এরা অনেক দীর্ঘ সময় ধরে চলাচল করার কারণে পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে সময় বেশি খানিকটা কম-বেশি লাগতে পারে। ১৯৮৭এ সুপারনোভা থেকে আসা নিউট্রিনোদের পৌঁছানোর সময়ের তারতম্য বিশ্লেষণ করে বলা যাবে নিউট্রিনোর সর্বোচ্চ নিশ্চল ভর কত হতে পারে। এবং এভাবে এটা পাওয়া গেছে ইলেকট্রনের ভরের ৩০ হাজার ভাগের প্রায় এক ভাগ।

তবে দূর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, বিষয়টায় জটিলতা আরও আছে। কারণ নিউট্রিনোর প্রকারভেদ আছে একের বেশি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিশ্চল ভর বের করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী পাউলির প্রস্তাবিত নিউট্রিনো নিয়ে হিসাব করা হয়। কিন্তু পরের দ্বিতীয় আরেক ধরনের নিউট্রিনো পাওয়া গেছে। তৃতীয় আরেক ধরনের নিউট্রিনোর কথা বিগ ব্যাং এর সময়ের এই তিন রকমের নিউট্রিনোই ব্যাপক আকারে তৈরি হয়ে থাকবে। এর মধ্যে বাকি দুই ধরনের নিউট্রিনোর ভরের সীমা কত হবে তা সরাসরি বলা খুব কঠিন। পরীক্ষামূলকভাবে মানের সীমার পাল্লা অনেক বড়। তবে তাত্ত্বিকরা বলছেন, মহাবিশ্বের ভরে নিউট্রিনোর ভর সম্ভবত বড় কোনো ভূমিকা রাখছে না। নিউট্রিনোর ভর বের করার নতুন পরীক্ষামূলক পদ্ধতির আলোকে এই ধারণা বদলেও যেতে পারে।

আবার মহাবিশ্বের ওজন মাপতে গেলে যে নিউট্রিনো ছাড়া সম্ভাব্য অন্য আরও মহাজাগতিক ধ্বংসাবশেষও থাকতে পারে। বিগ ব্যাং এর সময় অন্যান্য স্থিতিশীল ও দুর্বলভাবে ক্রিয়া করা কণাও তৈরি হয়ে থাকতে পারে। হতে পারে সেগুলোর ভর আরও বেশি। (তবে ভর আবার বেশি হলে অপেক্ষাকৃত অল্প ভরের কণার তুলনায় এরা কম তৈরি হবে। কারণ বেশি ভরের কণা তৈরিতে বেশি ভর লাগে) এদেরকে সাধারণভাবে বলা হয় উইম্প (WIMP)। কথাটার পূর্ণরূপ হলো দুর্বল মিথষ্ক্রিয়ায় অংশ নেওয়া ভারী কণা (Weakly Interacting Massive Particles)। বিজ্ঞানীদের প্রস্তাবিত উইম্প কণার সংখ্যা অনেক। এদের গালভরা নামও আছে। এই যেমন গ্র্যাভিটন, হিগসিনো, ফোটিনো। এরা আসলেই আছে কি না তা কেউ জানে না। তবে আসলেই থাকলে মহাবিশ্বের ওজন মাপতে এদের ভূমিকা মাথায় রাখতেই হবে।

লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো, উইম্প কণাদের অস্তিত্ব আছে কি না তা সরাসরিই পরীক্ষা করে ফেলা যায়। সাধারণ পদার্থের সাথে এদের মিথষ্ক্রিয়ার ধরন থেকে এটা অনুমান করা যাবে। এই মিথষ্কিয়া খুব দুর্বল তা সত্য। তবে বিপুল পরিমাণ উইম্প কণার ভর উল্লেখযোগ্য হবে। চলন্ত উইম্প কণা শনাক্ত করতে পরিকল্পনাও করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব ইংল্যান্ডের একটি লবণের খনি ও স্যান ফ্র্যান্সিস্কোর একটি বাঁধের কাছে এলাকাকে পরীক্ষার স্থান হিসেবে বাছাই করা হয়েছে। মহাবিশ্বের এদের উপস্থিতি অনেক বেশি ধরে নিলে সবসময় এরা বিপুল সংখ্যায় আমাদের শরীর (এবং পৃথিবী) ভেদ করে চলে যাচ্ছে। এই পরীক্ষার মূলনীতি খুব দারুণ। উইম্প কণা পরমাণুর নিউক্লিয়াসের সাথে ধাক্কা খেলে যে শব্দ হবে, শনাক্ত করা হবে সেই শব্দ।

এর জন্য যন্ত্র বানানো হবে জার্মেনিয়াম বা সিলিকনের একটি স্ফটিক দিয়ে। যা একটি শীতলীকরণ ব্যবস্থা দিয়ে আবৃত থাকবে। উইম্প কণা স্ফটিকের নিউক্লিয়াসে আঘাত করলে এর ভরবেগের কারণে নিউক্লিয়াস পেছন দিকে ধাক্কা অনুভব করবে। এ ধাক্কার ফলে স্ফটিক ল্যাটিসে ছোট্ট একটি শব্দ তরঙ্গ বা কম্পন তৈরি হবে। তরঙ্গ প্রসারিত হতে থাকলে এর তীব্রতা একটি কমে আসবে। পরিণত হবে তাপশক্তিতে। ক্রমশ দুর্বল হতে থাকা শব্দ তরঙ্গ থেকে উৎপন্ন তাপের সূক্ষ্ম সঙ্কেত শনাক্ত করার জন্যে এ পরীক্ষার নকশা প্রস্তুত করা হয়েছে। স্ফটিকের তাপমাত্রা কমিয়ে প্রায় পরম শূন্য পর্যন্ত আনা হয় বলে যে-কোনো তাপ শক্তির আবির্ভাবকেই ডিটেক্টর দারুণ দক্ষতার সঙ্গে শনাক্ত করে ফেলবে।

তাত্ত্বিকরা ধারণা করছেন, কিছুটা অল্প গতিতে ছোটা ফোটার আকৃতির উইম্পদের ঝাঁকের মধ্যে ডুবে আছে ছায়াপথগুলো। এই উইম্পদের ভর হয়ত একটি থেকে এক হাজার প্রোটনের ভরের মাঝামাঝি। আর গড় ভর সেকেন্ডে কয়েক হাজার কিলোমিটার। আমাদের সৌরজগৎ আমাদের ছায়াপথকে ঘিরে পাক খাওয়ার সময় এই অদৃশ্য জায়গা অতিক্রম করে। আর পৃথিবীর প্রতি কেজি পদার্থ প্রতি দিন এক হাজারটি পর্যন্ত উইম্প কণা বিক্ষেপ করতে পারে। এই হারে বিক্ষিপ্ত হলে উইম্প কণাকে সরাসরি খুঁজে পাওয়া কঠিন হবার কথা নয়।

একদিকে উইম্প কণার খোঁজ চলছে। অন্য দিকে জ্যোতির্বিদরা মহাবিশ্বের ভর জানার চেষ্টাও করে যাচ্ছেন। একটি বস্তুকে দেখা (বা শোনা না গেলেও) এর মহাকর্ষীয় টান কিন্তু নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে না। নেপচুন গ্রহের আবিষ্কারের কথাই ধরুন না। জ্যোতির্বিদরা খেয়াল করলেন, অচেনা একটি বস্তুর ময়াহকর্ষীয় টানে ইউরেনাসের কক্ষপথে নড়চড় হচ্ছে। লুব্ধক বি একটি অনুজ্জ্বল শ্বেত বামন নক্ষত্র। উজ্জ্বল নক্ষত্র লুব্ধককে কেন্দ্র করে ঘোরে এটি। এই বি লুব্ধককেও কিন্তু এভাবেই পাওয়া গেছে। তার মানে, বস্তুর পর্যবেক্ষণযোগ্য গতি খেয়াল করে জ্যোতির্বিদরা অদেখা বস্তুরও চিত্র আঁকতে পারেন। (আমি আগেই বেলছি, কীভাবে এই পদ্ধতিতে সিগ্ন্যাস-১ বস্তুটিকে ব্ল্যাক হোল হিসেবে অনুমান করা হয়েছিল।)

আমাদের ছায়াপথে নক্ষত্ররা কীভাবে চলছে সে বিষয়ে গত এক বা দুই দশকে খুব নিবিড় গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। সাধারণত নক্ষত্ররা মিল্কিওয়ে বা আকাশগঙ্গা ছায়াপথের কেন্দ্রকে বিশ কোটি বছরের চেয়ে বেশি সময় নিয়ে প্রদক্ষিণ করে। ছায়াপথের আকৃতি কিছুটা চাকতির মতো। কেন্দ্রের দিকে নক্ষত্রের ঘনত্বটা একটু বেশি। ফলে সৌরজগতের সূর্য ও গ্রহের সম্পর্কের মতো প্রায় একই রকম একটি ব্যাপার আছে এখানে। তবে সৌরজগতে বুধ ও শুক্রের মতো পৃথিবী থেকেও ভেতরের দিকের গ্রহগুলো ইউরেনাস বা নেপচুনের মতো বাইরের দিকের গ্রহদের চেয়ে জোরে চলে। এর কারণ হলো ভেতরের দিকের গ্রহগুলো সূর্যের মহাকর্ষীয় টান বেশি অনুভব করে। আমরা হয়ত আশা করব, ছায়াপথের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি এমনই হবে। চাকতির বাইরের দিকের নক্ষত্রগুলো কেন্দ্রের দিকের নক্ষত্রদের তুলনায় অনেক ধীরে ঘোরা উচিত।

কিন্তু পর্যবেক্ষণ বলছে ভিন্ন কথা। পুরো চাকতি জুড়েই নক্ষত্রদের বেগ প্রায় সমান। ব্যাখ্যা হিসেবে বলা যেতে পারে, ছায়াপথের ভর হয়ত কেন্দ্রে পুঞ্জিভূত নয়। বরং পুরো ছায়াপথজুড়ে সমভাবে বিস্তৃত। ছায়াপথের চেহারা দেখে মনে হয়, ভর কেন্দ্রেই পুঞ্জিভূত। তবে আলোকজ্জ্বল অংশ হয়ত পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেখাচ্ছে না। এটা স্পষ্ট যে প্রচুর পরিমাণ অন্ধকার বা অদৃশ্য বস্তু রয়েছে। এর বড় একটি অংশের অবস্থান চাকতির বাইরের দিকে। আর এটাই সেদিকের নক্ষত্রের বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে। আবার চাকতির উজ্জ্বল তলের বাইরে খালি চোখে অদৃশ্য ডার্ক ম্যাটারও থাকতে পারে প্রচুর। এটা হলে আকাশগঙ্গা ঢাকা থাকে বিশাল ভারী এক অদৃশ্য বলয় দিয়ে। এই বলয় আন্তঃছায়াপথীয় স্থানের অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃতি। অন্য ছায়াপথেও একই রকম বিন্যাস চোখে পড়ে। হিসেব বলছে, (সূর্যের তুলনায়) উজ্জ্বলতা দেখে যতটা মনে হয় ছায়াপথের দৃশ্যমান অংশ গড়ে তার দশ গুণের বেশি অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। সবচেয়ে বাইরের দিকে অঞ্চলে আবার এই বিস্তৃতি পাঁচ হাজার গুণ পর্যন্তও হতে পারে।

ছায়াপথগুচ্ছের মধ্যে ছায়াপথের চলাচলের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। পরিষ্কার কথা: কোন ছায়াপথ যথেষ্ট বেগে চললে সেটি ছায়াপথ গুচ্ছের টান ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে। গুচ্ছের সব ছায়াপথ এই বেগে ঘুরলে গুচ্ছ ক্রমেই নিঃশেষ হয়ে আসবে। কোমা মণ্ডলে আছে কয়েকশ ছায়াপথ নিয়ে গড়া একটি আদর্শ ছায়াপথ পুঞ্জ। এটি নিয়ে অনেক বেশি গবেষণা করা হয়েছে। এই গুচ্ছে ছায়াপথদের গড় গতিবেগ এতটা বেশি যে এদের পক্ষে এক অপরের সাথে মিলেমিশে থাকার কথা নয়। এটা একমাত্র সম্ভব যদি ছায়াপথে উজ্জ্বল বস্তুদের ভরের চেয়ে অন্তত কয়েকশ গুণ ভর বেশি উপস্থিত থাকে। কোমা গুচ্ছকে অতিক্রম করতে একটি সাধারণ ছায়াপথের মাত্র প্রায় একশ কোটি বছর সময়ের প্রয়োজন হয়। ফলে এত দিনে গুচ্ছটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার কথা। সেটা কিন্তু ঘটেনি। উপরন্তু, গুচ্ছে কাঠামো দেখে খুব ভালোভাবে মনে হচ্ছে, এটি মহাকর্ষের বন্ধনে আবদ্ধ আছে। মনে হচ্ছে, কোনো এক ধরনের ডার্ক ম্যাটার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উপস্থিত আছে। যা ছায়াপথের গতিকে প্রভাবিত করছে।

মহাবিশ্বের অতি-বড়-মাপকাঠির গঠন থেকে অদেখা বস্তু সম্পর্কে আরও একটি ধারণা পাওয়া যায়। অতি-বড়-মাপকাঠি বলতে আমরা বুঝি ছায়াপথের ক্লাস্টার (গুচ্ছ) ও সুপারক্লাস্টারদের গুচ্ছবদ্ধ হবার প্রক্রিয়া। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা বলেছি, ছায়াপথদের বিস্তৃতি অনেকটা ফেনার মতো। ছড়িয়ে পড়া আঁশের মতো। কিংবা বিশাল শূন্যতাকে ঘিরে থাকা চাদরের মতো। বিগ ব্যাংয়ের এর পরে যতটুকু সময় অতিবাহিত হয়েছে তাতে এমন গুচ্ছবদ্ধ ও ফেনিল কাঠামো গড়ে ওঠার কথা নয়। তবে এটা হতে পারে যদি কোনো অনুজ্জ্বল বস্তু বাড়তি মহাকর্ষ সরবরাহ করে। কম্পিউটার সিমুলেশনের সাহায্যে এখন পর্যন্ত সরল কোনো ডার্ক ম্যাটারের ধারণা ব্যবহার করে এ রকম ফেনিল কোনো কাঠামো তৈরি করা সম্ভব হয়নি।৫ হতে পারে আরও কোনো জটিল উপাদান রয়েছে মহাবিশ্বে।

ডার্ক ম্যাটারের রহস্য বুঝতে বিজ্ঞানীরা এখন ব্যতিক্রমী কিছু কণার খোঁজ করছেন। তবে ডার্ক ম্যাটার পরিচিতি বস্তুর আকারেও থাকতে পারে। সেটা হতে পারে গ্রহের আকারের অনুজ্জ্বল নক্ষত্র। এমন অন্ধকার বস্তু হয়তো আমাদের অজান্তেই ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের চারাপাশের মহকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সম্প্রতি জ্যোতির্বিদরা দৃশ্যমান বস্তুদের সাথে মহাকর্ষীয় বন্ধনে আবদ্ধ অন্ধকার বস্তুদেরকে খুঁজে পাওয়ার একটি উপায় বের করেছেন। এ কৌশলে আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিকতার একটি ফলাফল ব্যবহার করা হয়। নাম মহাকর্ষীয় বক্রতা (Gravitational lensing)।

আমরা জানি, মহাকর্ষ আলোকে বাঁকিয়ে দিতে পারে। আইনস্টাইন বলেছিলেন, দূরের নক্ষত্রের আলো সূর্যের কাছ দিয়ে আসার সময় কিছুটা বেঁকে যাবে। এর ফলে আকাশে নক্ষত্রটির আপাত অবস্থান একটু পাল্টে যাবে। আশেপাশে সূর্যের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির প্রভাব লক্ষ করে এই পূর্ভাবাস যাচাই করে দেখা যায়। কাজটি প্রথম করেন ব্রিটিশ জ্যোতির্বিদ আর্থার এডিংটন। ১৯১৯ সালে। দারুণভাবে তিনি আনিনস্টাইনের বক্তব্যটি প্রমাণ করেন।

লেন্সও আলোকরশ্মিকে বাঁকিয়ে দেয়। এর ফলে এরা আলোকে কেন্দ্রীভূত করে বিম্ব (ছবি) তৈরি করতে পারে। একটি ভারই বস্তু যথেষ্ট প্রতিসম হলে লেন্সের মতোই আচরণ করবে। দূরের উৎস থেকে আসা আলোকে কেন্দ্রীভূত করবে। এমন একটি ঘটনা ৬.১ চিত্রে দেখানো হয়েছে। উৎস S থেকে আলো একটি গোলকীয় বস্তুর কাছে এসে পড়লে বস্তুর মহাকর্ষ এর পাশের আলোকে বাঁকিয়ে দিচ্ছে। ফলে আলোকরশ্মিগুলো দূরের আরেকটি বিন্দুতে গিয়ে মিলিত হচ্ছে। বেশিরভগা বস্তুর ক্ষেত্রেই বক্রতার প্রভাব খুব সামান্য। তবে বিশাল দূরত্বের ক্ষেত্রে আলোর চলার পথের সামান্যটুকু বক্রতাও উল্লেখযোগ্য ফোকাস তৈরি করবে। বস্তুটা যদি পৃথিবী ও দূরবর্তী উৎসের মাঝখানে থাকে, তাহলে উৎসের খুব উজ্জ্বল একটি ছবি দেখা যাবে। আবার কিছু ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে দৃষ্টিরেখা জায়গামতো পড়লে আলোর উজ্জ্বল বৃত্তও দেখা যেতে পারে। একে বলা হয় আইনস্টাইন বলয় (Einstein ring)। আরও জটিল বস্তুর ক্ষেত্রে লেন্সিংয়ের ফলে একটির বদলে অনেকগুলো ছবি তৈরি হবে। মহাজাগাতিক মাপকাঠিতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাকর্ষীয় বক্রতার অনেকগুলো উদাহরণ খুঁজে পেয়েছেন। পৃথিবী ও দূরবর্তী কোয়াসারের প্রায় নিখুঁত অবস্থানে কোয়াসারের অনেকগুলো ছবি তৈরি হয়। কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় বৃত্তচাপ। কিছুক্ষেত্রে আবার কোয়াসারের পুরো বৃত্তও দেখা যায়।

চিত্র ৬.১ চিত্র: মহাকর্ষীয় লেন্স। দূরবর্তী উৎস S থেকে আসা আলো ভারী বস্তুর প্রভাবে বেঁকে যায়। অনুকূল ক্ষেত্রে এটি আলোকে কেন্দ্রীভূত করে। ফোকাস বিন্দুতে থাকা পর্যবেক্ষক বস্তুর চারপাশে আলোর একটি বলয় দেখতে পাবেন।

অদৃশ্য গ্রহ ও অনুজ্জ্বল বামন নক্ষত্র খুঁজতে গিয়ে জ্যোতির্বিদরা এমন বক্রতার সন্ধান করেন। বস্তুটা পৃথিবী ও দূরের কোনো নক্ষত্রের মাঝে থাকলে বক্রতা সেই খবর বলে দেবে। দৃষ্টিরেখা থেকে অদেখা বস্তুটির নড়াচড়ার কারণে নক্ষত্রের উজ্জ্বলতায় দৃশ্যমান উঠা-নামা চোখে পড়বে। বস্তুটা নিজে অদৃশ্য হলেও লেন্সিংয়ের মাধ্যমে এর প্রভাব বোঝা যাবে। এই কৌশল কাজে লাগিয়ে কিছু বিজ্ঞানী আকাশগঙ্গা ছায়াপথের হ্যালোতে (halo) অদৃশ্য বস্তুর খোঁজ করছেন। অবশ্য দূরবর্তী নক্ষত্রের সাথে অবস্থান একই রেখায় না হবার সম্ভাবনা খুব কম হলেও অদৃশ্য বস্তুর সংখ্যা বেশি হলে মহাকর্ষীয় বক্রতা দেখা যাবেই। ১৯৯৩ সালের কথা। অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের একটি দল নিউ সাউথ ওয়ালসের মাউন্ট স্ত্রোমলো পর্যবেক্ষণকেন্দ্র থেকে লার্জ ম্যাজেলানিক ক্লাউড ছায়াপথের নক্ষত্রদের দেখছিলেন। মহাকর্ষীয় বক্রতার প্রথম সত্যিকার নিদর্শন তাঁরাই খুঁজে পান। এটা ছিল আমাদের ছায়াপথের হ্যালোতে থাকা একটি বামন নক্ষত্রের লেন্সিং।

ব্ল্যাক হোলরাও মহাকর্ষীয় লেন্স হিসেবে কাজ করে। ছায়াপথের বাইরের বেতার উৎস ব্যবহার করে এমন ব্ল্যাক হোলকে ব্যাপকভাবে খোঁজা হয়েছে। (আলোক তরঙ্গের মতো একইভাবে বেতার তরঙ্গও বেঁকে যায়। ) অবশ্য সম্ভাব্য বস্তু পাওয়া গেছে খুব কমই। এটা থেকে মনে হচ্ছে, নাক্ষত্রিক বা অতি-ভারী ব্ল্যাক হোলরা হয়ত ডার্ক ম্যাটারের জন্য খুব বেশি দায়ী নয়।

তবে সব লেন্সিংয়ের জরিপে সব ব্ল্যাক হোল কিন্তু দেখাও যাবে না। এটাও আবার সম্ভব যে বিগ ব্যাং পরবর্তী চরম অবস্থায় আণুবীক্ষণিক (microscopic) ব্ল্যাক হোলের জন্ম হয়ে থাকবে। এদের আকার হবে পরমাণুর নিউক্লিয়াসের চেয়ে ছোট। এক্ষেত্রে এদের ভর হবে একটি সাধারণ গ্রহাণুর ভরের সমান। এভাবে প্রচুর পরিমাণ ভর অদৃশ্য থাকতে পারে। এই ভর ছড়িয়েও থাকবে পুরো মহাবিশ্বে। শুনতে অবাক লাগলেও এই অদ্ভুত বস্তুগুলোর ভরেরও একটি নির্দিষ্ট সীমা বের করা সম্ভব। কৌশলটার নাম হলো হকিং প্রভাব (Hawking effect)। ৭ম অধ্যায়ে আমরা এটা নিয়ে বিস্তারিত জানব। সংক্ষেপে বলা যায়, আণুবীক্ষণিক ব্ল্যাক হোলরা বিস্ফোরিত হয়ে এক ঝাঁক বৈদ্যুতিক চার্জগ্রস্থ কণা তৈরি হতে পারে। এই বিস্ফোরণ ঘটে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে। এটা নির্ভর ক্রে ব্ল্যাক হোলের সাইজের ওপর। ছোট ব্ল্যাক হোলরা বিস্ফোরিত হয় দ্রুত। একটি গ্রহাণুর সমান ভরের ব্ল্যাক হোল বিস্ফোরিত হয় এক হাজার কোটি বছর পার হলে। তার মানে বর্তমান সময়ের কাছাকাছি সময়। এই বিস্ফোরণের একটি প্রভাব হবে হঠাৎ করে বেতার তরঙ্গের সৃষ্টি। বেতার জ্যোতির্বিদরা বিষয়টি যাচাইও করে দেখেছেন। তবে এমন সম্ভাব্য কোনো সঙ্কেত পাওয়া যায়নি। হিসেব করে দেখা গেছে, প্রতি ৩০ বছরে প্রতি ঘন আলোকবর্ষ জায়গায় এমন বিস্ফোরণ একটির বেশি ঘটা সম্ভব নয়। ৫ এর অর্থ হলো, মহাবিশ্বের মোট ভরের খুব সামান্য একটি অংশই আণুবীক্ষণিক ব্ল্যাক হোলগুলো থেকে পাওয়া যাবে।

আরেকটি কথা হলো, মহাবিশ্বে ডার্ক ম্যাটারের পরিমাণ নিয়েও একেক জ্যোতির্বিদের একেক মত। মহাবিশ্বের প্রসারণ ঠেকাতে যতটুকু ঘনত্ব প্রয়োজন ঠিক তার চেয়ে কম ন্যূনতম ভরকে বলা হয় সঙ্কট ঘনত্ব (critical density)। হিসেব করে এর ভর পাওয়া গেছে দৃশ্যমান ভরের প্রায় একশ গুণ। টেনেটুনে হলেও এ পরিমাণ ভরের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। আশা করতে হবে, ডার্ক ম্যাটারের অনুসন্ধান থেকে শীঘ্রই সুনির্দিষ্ট ইতিবাচক বা নেতিবাচক ফল পাওয়া যাবে। আর যাই হোক, মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ দাঁড়িয়ে আছে এর ওপর।

আমাদের বর্তমান জ্ঞানের আলোকে আমরা বলতে পারি না মহাবিশ্ব চিরকাল প্রসারিত হবে কি না। যদি একসময় এটি সঙ্কুচিত হতে শুরু করে, তবে প্রশ্ন দাঁড়াবে, সেটা কখন? এটা বলতে হলে জানতে হবে মহাবিশ্বের ভর সঙ্কট ভরের চেয়ে কতটা বেশি। যদি এটা শতকরা এক ভাগ বেশি হয়, তাহলে প্রায় এক ট্রিলিয়ন (বা এক লক্ষ কোটি) বছর পরে মহাবিশ্ব সঙ্কুচিত হতে শুরু করবে। আবার যদি সেটা শতকরা ১০ ভাগ বেশি হয়, তাহলে সঙ্কোচন শুরু হয়ে যাবে এখন থেকে ১০ হাজার কোটি বছর পরেই।

তবে কোনো কোনো তাত্ত্বিক আবার মনে করেন, শুধু হিসেব-নিকেশ করেই মহাবিশ্বের ভর বের করে ফেলা সম্ভব। তাদের মতে, কষ্ট করে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের কোনো প্রয়োজন নেই। নিছক যুক্তির ক্ষমতা ব্যবহার করেই যে মানুষ মহাজাগতিক জ্ঞানও আহরণ করে ফেলতে পারে এমন বিশ্বাস গ্রিক দার্শনিকদের পর্যন্ত ছিল। আধুনিক যুগেও কিছু কসমোলজিস্ট মহাবিশ্বের ভরকে গণিতের ছকে চেয়েছেন বেঁধে ফেলতে চেয়েছেন। তাদের মতে, গভীর কোনো নীতিমালা মহাবিশ্বের ভরের একটি নির্দিষ্ট মান সরবরাহ করবে। এদের মধ্যে সবচেয়ে তাক লেগে যায় সেই সিস্টেমগুলো দেখে, যেগুলো দিয়ে মহাবিশ্বের কণার সংখ্যার সঠিক পরিমাণ সাংখ্যিক সূত্র দিয়ে বের করা যায়।

বাস্তবতার সাথে সম্পর্কহীন এমন চিন্তাগুলো দেখতে-শুনতে দারুণ হলেও বেশিরভাগ বিজ্ঞানীরাই পছন্দ করেন না। তবে সাম্প্রতিক সময়ে আরেকটি জোরালো তত্ত্ব একটু জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এটি মহাবিশ্বের ভর সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট পূর্বাভাস দিতে পারছে। তত্ত্বটি হলো তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত স্ফীতি তত্ত্ব।

স্ফীতি তত্ত্বের একটি পূর্বাভাস হলো মহাবিশ্বে উপস্থিত বস্তুর পরিমাণ নিয়ে। ধরা যাক, মহাবিশ্বের সূচনা ঘটেছে সঙ্কট ভর ঘনত্বের চেয়ে অনেক বেশি বা অনেক কম মান নিয়ে। স্ফীতি যুগ শুরু হলে ঘনত্বের আমূল পরিবর্তন ঘতে যায়। তত্ত্বের ভাষ্য মতে, ঘনত্ব সঙ্কট ঘনত্বের মানের খুব কাছে চলে আসে। মহাবিশ্ব যত বেশি সময় ধরে স্ফীত হতে থাকে, ঘনত্ব ততই সঙ্কট মানের কাছাকাছি হতে থাকে। তত্ত্বটির আদর্শ নমুনা অনুসারে, স্ফীতি যুগের মেয়াদ ছিল খুব সামান্য। তাই, অলৌকিক কিছু না ঘটে থাকলে প্রাথমিক অবস্থায় মহাবিশ্বের ঘনত্ব সঙ্কট ঘনত্বের ঠিক সমান হওয়ার কথা নয়। সামান্য কম-বেশি হবেই।

তবে স্ফীতির সময়ে ঘনত্বের মান সঙ্কট মানের দিকে যেতে থাকে সূচকীয় হারে। ৬ ফলে ঘনত্বের চূড়ান্ত মান সঙ্কট মানের চেয়ে একটু বেশি হতে পারে। স্ফীতি যুগ যদি সেকেন্ডের খুব সামান্য এক ভগ্নাংশ সময় পরিমাণও টিকে থাকে তবুও এটাই হওয়ার কথা। এখানে সূচকীয় বলতে বোঝানো হচ্ছে, স্ফীতির প্রায় প্রতি একক বাড়তি সময়ের জন্যে বিগ ব্যাং ও মহাবিশ্বের সঙ্কোচন পর্যায়ের মধ্যে সময় দ্বিগুণ হবে। ফলে একশ একক স্ফীতি সঙ্কোচনে ১০ হাজার কোটি বছর দেরি হবে। আবার একশ একটি একক স্ফীতির জন্যে সঙ্কোচন শুরু হবে ২০ হাজার কোটি বছর পরে। এবং একশ দশ একক স্ফীতির জন্যে সঙ্কোচন শুরু হবে এক লক্ষ কোটি বছর পরে।

স্ফীতি যুগ কতক্ষণ স্থায়ী হয়েছিল? কেউ সেটা জানে না। তবে যেসব মহাজাগতিক ধাঁধার কথা আমি বলেছি, সেগুলোকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে হলে স্ফীতির সময় ন্যূনতম কয়েক একক (প্রায় একশ, যদিও মানটি এদিক-সেদিক হতে পারে) হতেই হয়। তবে কোনো উর্ধ্ব সীমা নেই। ধরুন, কাকতালীয়ভাবে এমন ঘটেছে যে আমাদের বর্তমান পর্যবেক্ষণকে ব্যাখ্যা করার জন্যে স্ফীতির যে ন্যূনতম একক দরকার ঠিক ততটাই হয়েছিল। সেক্ষেত্রেও স্ফীতির পরেও ঘনত্ব সঙ্কট ভরের চেয়ে অনেক বেশি (বা কম) হবে। এক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ পর্যবেক্ষণ থেকে সঙ্কোচন যুগ বের করতে পারার কথা। অথবা সঙ্কোচন না হয়ে থাকার কথা থাকলে সেটাও বোঝা যাবে। তবে স্ফীতি ন্যূনতম সময়ের চেয়ে আরও অনেক বেশি সময় ধরে চলার সম্ভাবনাই অনেক বেশি। এর ফলে ঘনত্বের মান হবে সঙ্কট মানের খুব কাছাকাছি। তার মানে, মহাবিশ্ব সঙ্কুচিত হয়ে থাকলেও সেটা আরও বহু কাল পরের কথা। মহাবিশ্বের বর্তমান বয়সের চেয়েও বেশি সময় লাগবে তাতে। সেটাই হয়ে থাকলে মানুষ কখনোই নিজের মহাবিশ্বের ভবিষ্যতটাই জানবে না।

অনুবাদকের নোটঃ

১। ক্রমশ দূরে সরতে থাকা বস্তুর একটি ফলাফল হলো লোহিত সরণ প্রভাব (red shift)। মহাবিশ্বের প্রসারণের সাথে সাথে প্রায় সব গ্যালাক্সি আমাদের থেকে দূরে সরে যায়। এ কারণে এদের থেকে আসা দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বড় হয়ে যায়। দৃশ্যমান আলোর মধ্যে লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বড়। আর সবচেয়ে কম নীল আলোর। গ্যালাক্সিরা দূরে সরতে সরতে এদের থেকে আসা আলো বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রে লাল দিকে চলে আসে। এটারই নাম লোহিত সরণ। আবার উল্টো দিকে কোনো গ্যালাক্সি বা অন্য কোনো বস্তু কাছে আসলে তার আলো চলে যায় নীল দিকে। স্বাভাবিকভাবেই একে বলা নীল সরণ (blue shift)।

২। কারণ মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে বহু গ্যালাক্সি এখনই আলোর কাছাকাছি, এমনকি বেশি বেগেও ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ছে। মুক্তিবেগ আলোর মাত্র এক শতাংশ হলে সে প্রসারণ থামার কোনো কারণ নেই। মহাকর্ষের টানকে অগ্রাহ্য করে পিছিয়ে না এসে দূরে চলে যাবার জন্যে প্রয়োজনীয় বেগকেই কিন্তু মুক্তিবেগ বলা হয়।

৩। রাতের আকাশে হাজার হাজার নক্ষত্র দেখলেও খালি চোখে কিন্তু মাত্র ৫টি গ্রহ দেখতে পাই। মানে, সৌরজগতের সবগুলো গ্রহই কিন্তু খালি চোখে দেখা সম্ভব হয় না। মনে হতে পারে, টেলিস্কোপ দিয়েও অনেক গ্রহ দেখতে পাই। আসলে টেলিস্কোপ দিয়েও নক্ষত্রদের তুলনায় গ্রহ ঢের কম দেখা যায়। আকারে ছোট হওয়ার কারণে ও নিজস্ব আলো না থাকায় দূরের গ্রহদেরকে টেলিস্কোপে পেতে বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত মাত্র ৩৯১৭ টি বহির্গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে। যেখানে নক্ষত্রের অবস্থান উল্লেখ করা বিভিন্ন তালিকাতেই লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের নাম আছে।

৪। ইলেকট্রনের প্রকৃত ভর ৯.১০৯ × ১০-৩১ কেজি। মানে দশমিকের পর ৩০টি শূন্য দিয়ে ৯১০৯ লিখলে যে সংখ্যাটি হবে।

৫। ঘন মিটার যেমন বস্তু বা স্থানের আয়তন পরিমাপে ব্যবহৃত হতে পারে, তেমনি ঘন আলোকবর্ষ একক দিয়েও স্থানের আয়তন পরিমাপ করা যায়। আলো এক বছরে যতটুকু যায় সেটা হলো এক আলোকবর্ষ। তার মানে আলোকবর্ষ সময়ের একক নয়, বরং দূরত্বের একক। এবার ঘনকের মতো একটি কক্ষের কথা চিন্তা করুন। এবার এই কক্ষের দৈর্ঘ্যকে এক আলোকবর্ষ ভাবুন। তাহলে এই কক্ষটির আয়তনই হবে এক ঘন আলোকবর্ষ।

৬। আমরা গাণিতিক ও জ্যামিতিক হারের সাথে পরিচতি। সূচকীয় হার জ্যামিতিক হারেরই একটি রূপ। গাণিতিক হার বলতে বোঝায় নির্দিষ্ট সময় পরপর নির্দিষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া। জ্যামিতিক হার মানে প্রতি বার বাড়ার পর যে মান দাঁড়াবে তার ভিত্তিতে বাড়া। আর সূচকীয় হারও জ্যামিতিক হার। তবে এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের পরপরের বদলে প্রতি মুহূর্তে। যেমন ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি। আরও জানতে দেখুন- statmania.info।